মাইজভাণ্ডার শরিফ পরিচিতি

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী খাতেমুল অলদ

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)

মাইজভাণ্ডার শরিফ পরিচিতি

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা
আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে–

প্রকাশক:
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক– ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম– ৪৩৫২

গ্রন্থস্বত্ব:
প্রকাশক

গ্রন্থকার:
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

প্রথম প্রকাশ : ১১ অক্টোবর ২০১৪
পঞ্চম প্রকাশ : ২৪ জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ:
ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (লেভেল ১২)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ৪২১২।

ISBN: 978-984-8083-20-8

মূল্য: ১০০ টাকা

উৎসর্গ

পবিত্র আওলাদে রাসূল (দ.), মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, পূর্ণতাদানকারী প্রাণপুরুষ গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর পৌত্র, অছি ও সাজ্জাদানশীন, এ ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক ও স্বরূপ উন্মোচক খাদেমুল ফোক্বারা
শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী
এবং
তাঁর কর্ম ও মর্মের সৃজনশীল বিকাশের দায়িত্বশীল প্রত্যয়দীপ্ত বাণী বাহক সংগঠন তদীয় প্রথম পুত্র শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত SZHM TRUST.

ভূমিকা

পবিত্র আওলাদে রাসূল (দ.) মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, পূর্ণতাদানকারী গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) (১৮২৬-১৯০৬) জীবদ্দশায়, তাঁর কামালিয়তের চূড়ান্ত বিকাশ সময়ে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কবি আহমদ আলী মিয়ার 'বড় তুফানের কবিতায়' চট্টগ্রামের প্রলয়ংকরী তুফানের বর্ণনা প্রসঙ্গে মাইজভাণ্ডার ও আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর তুঙ্গীয় জনপ্রিয়তা সূচক ব্যাপক পরিচিতির চুম্বকসার বর্ণনা পাওয়া যায় এ ভাবে–

মাইজভাণ্ডার, বিনাজুরী, কুতুবছড়ি, দমদমা-রায়পুর।
মৌলভী আহমদ উল্লাহ্ জান জগতে মশুর [মশহুর] ॥[১]

'জগতে মশুর' এ অভিধার নতুনমাত্রিক অনুরণন শুনা যায় পরবর্তীকালে কবি অমলেন্দু বিশ্বাসের গানে–
চাডিয়ার জ্ঞানের চাত্তি কভু নিভেনা/ও তার সাগর ঘেরা, পাহাড়বেড়া পীর সন্ন্যাসীর আস্তানা।
বদরশাহ, আমানত, বায়েজিদ বোস্তাম, মোহেছেন, গরীব উল্লাহ্, শোকর, পেটান।
আহমদ উল্লাহ্ ভাণ্ডারী জান, মানুষ করে দেওয়ান ॥[২]

কালক্রমে এ 'দেওয়ান' যে শুধু চট্টগ্রাম কিংবা বঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, দেশের সীমানা ছাপিয়ে বহিঃর্বিশ্বে তাঁর ব্যাপক ও বহুল প্রচারিত জনপ্রিয়তার আরেক দৃষ্টি আর্কষণীয় চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে ১৯০৬ সালে তাঁর ওফাত উপলক্ষে রচিত তদীয় খলিফা আমিনুল হক হারবাঙ্গিরীর 'ওফাতনামা' কাব্যে–

খোদার গাউছের মৃত্যু যে জন দেখিল/অকস্মাৎ মুণ্ডে যেন বজ্রাঘাত পৈল।
চট্টগ্রাম সহরে ছিল যত নরনারী/ধুলায় ধুসরী কান্দে কুহরী-[২]
কলিকাতা, রেঙ্গুন, আরকান টেলিগ্রাফ খবর/হিন্দুস্থান, বোগদাদ, মিছির, আজমীর সহর ॥[৩]

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের পর এই ত্বরিকা আরো ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে (১) তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রধান খলিফা গাউসুল আযম বিল বিরাসত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সময়কালে। (২) এবং তদীয় পৌত্র ও অছি, স্থলাভিষিক্ত ও গদীনশীন, এই ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক ও স্বরূপ উন্মোচক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর মাধ্যমে তিনি তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা' এবং 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থ্ সহ বড়-ছোট ১২টি গ্রন্থ্ প্রকাশ করে এই ত্বরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছেন একান্ত বিশস্ততার সাথে।

বাবাভাণ্ডারী কেন্দ্রিক মাইজভাণ্ডারের জনসম্পৃক্ততা ও জনপ্রিয়তাকে মর্যাদাপূর্ণভাবে আমলে নিয়ে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ১৯৩৯ সালে তাঁর দ্বিতীয় উরস শরিফ উপলক্ষে সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে কনসেশন টিকেটে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিল।[৪]

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ও তাঁর খলিফাদের কেন্দ্র করে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ব্যাপক গুণগত ও পরিমাণগত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণীয়ভাবে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রয়োজনে মাইজভাণ্ডারী গানের সংগ্রহের কাজ শুরু হয়।[৫] এবং একই বছর অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্র সর্বপ্রথম মাইজভাণ্ডারী গান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে।[৬] এ সময়কালে (১৯২৯–৩৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায়ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্থান পায় মাইজভাণ্ডার শরিফ। স্বনামধন্য বাঙ্গালি মণীষা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পিএইচডি থিসিসে [History Of Suffisim In Bengal] বঙ্গে সুফিবাদের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র সমূহের মধ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফকে 'ফকিরদের একমাত্র জাগ্রত আড্ডাকেন্দ্র' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাত্ত্বিক গবেষণার সচেতন প্রয়াসে।[৭] শুধু তাই নয়, হাজার হাজার মাইজভাণ্ডারী গান, মাইজভাণ্ডারী উরস ও মেলা আবহমান বাংলার লোক ঐতিহ্যে সংযোজন করেছে তাৎপর্যপূর্ণ নতুন মাত্রিকতা। এতগুলো সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্বকে ধারণকারী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইতিহাসে পূর্বাপর আরো যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, শাহ্জাদা-এ-গাউসুল আযম সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী এবং অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর প্রথম পুত্র শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তাঁরা জন্মসূত্রে এবং স্বীয় অর্জনে, স্ব স্ব বিশেষত্বে এ ত্বরিকাকে নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবয়ব দান করেন এবং একে কালোপযোগী দৃষ্টি আকর্ষণীয়ভাবে নতুন মাত্রিকতায় 'জাগ্রত' করে তোলেন।

সুদূর ঊনবিংশ থেকে একবিংশ শতাব্দীকে ধারণ করে থাকা মাইজভাণ্ডারের শতাধিক বছরের ইতিহাসে উর্দূ, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় বড়-ছোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচিত হলেও এক নজরে, চুম্বকসার বর্ণনার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ মাইজভাণ্ডার বিষয়ে তথ্যনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়ার মতো কোন একক প্রকাশনা না থাকার কারণে সাধারণ পাঠক মহল, বিশেষত অনুসন্ধিৎসুজন, বিদ্বৎ সমাজ, সর্বোপরি আগ্রহী নতুন প্রজন্মের পাঠক সমাজ, ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তির চোরাগলি ও চোরাবালিতে পড়ে আশাভঙ্গের যাতনায় নিপতিত হওয়ার আশংকাও থেকে যায় সততঃ।

এবারের সংস্করণে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা সেল বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করায় তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এমতাবস্থায় অতি সংক্ষেপে ঐতিহ্যমণ্ডিত মাইজভাণ্ডার শরিফের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ের সু-সমন্বিত প্রয়াস এ ছোট্ট গ্রন্থ। নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমগ্র মাইজভাণ্ডার বিষয়ে এক পলকে মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এ কথা বিশ্বস্ততার সাথে উচ্চারণ করা যায়।

পীরবাড়ি, ফৌজদারহাট
উত্তর সলিমপুর, চট্টগ্রাম।
dr.salimjahangir1955@gmail.com

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর
রিসার্চ ফেলো, ফিনিস একাডেমি
হেলসিংকি, ফিনল্যান্ড।

---

১. আজ থেকে ১৪৩ বছর পূর্বের এটিই মাইজভাণ্ডার বিষয়ে প্রাচীনতম তথ্য। সূত্রঃ ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
২. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীঃ শতবর্ষের আলোকে, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম, দ্বি-প্র, ২০১২, পৃ.১২ [ISBN 984-32-2602-X]
৩. মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, বাংলা একাডেমি-ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ.৩৫০
৪. বিজ্ঞাপনের বর্ণনা ও আলোকচিত্র, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পূর্বোক্ত পৃ.১৬৮-১৬৯, ৪০৭
৫. সংগ্রাহক ছিলেন চট্টগ্রামের আশুতোষ চৌধুরী। উদ্ধৃত, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ.৩
৬. গীতিকার ও শিল্পী ছিলেন চট্টগ্রামের মোঃ নাসির। উদ্ধৃত, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ.১২
৭. এনামুল হক রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, মনসুর মুসা, বাংলা একাডেমি-ঢাকা, ১৯৯১, পৃ-১৩৮

সৃষ্টিজগতের রহমত স্বরূপ মহানবী (দ.)

খাতেমুন্নবী বা নবী আখেরুজ্জামান হযরত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) (৫৭০–৬৩২) একাধারে ইসলাম ধর্মমতের প্রবর্তক ও সফল সমাপ্তকারী হলেও তিনি শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন রহমতুল্লিল আলামিন তথা স্রষ্টার সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরপ।

একজন নবী হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকরূপে হযরত মোহাম্মদ (দ.) ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্যান্য নবী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তুলেছে। যেমন–

(১) তিনিই একমাত্র নবী, যিনি পবিত্র মেরাজের মাধ্যমে সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র দিদার লাভের সৌভাগ্যে মহা সৌভাগ্যবান। রোজ হাসরে তিনিই শাফায়াতের জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত রাসূল।

(২) তিনি ছিলেন নবী আখেরুজ্জামান– শেষ নবী। তবে স্রষ্টার মহিমাময় সৃষ্টিতে তিনিই প্রথম এবং পার্থিব ব্যবস্থাপনায় তিনিই শেষ নবী।

(৩) তিনিই পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রবর্তক।

(৪) তিনি আচার ধর্মের পাশাপাশি সুউচ্চ নৈতিকতা ও মানবিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

(৫) আখেরী নবী হিসেবে তিনি নবুয়ত ও বেলায়তের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন।

স্রষ্টার সৃষ্টি জগতের জন্য অসামান্য রহমত এবং অনন্তকালের তুলনারহিত আধ্যাত্মিক শক্তির অপূর্ব সমন্বয়ের তুঙ্গীয় বহিঃপ্রকাশ রূপে হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর শুভ আবির্ভাব।

নবুয়তি ও বেলায়তি যুগ

যেহেতু তিনি ছিলেন আখেরী নবী, তাঁর পরে যেহেতু আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না; এমতাবস্থায় তাঁর জাহেরী তথা শরিয়তি বিধানের পাশাপাশি আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক সংরক্ষণের লক্ষ্যে নৈতিক শক্তির ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনেই বিকাশ ঘটে বেলায়তী শক্তির।

নবী করিম (দ.) এর খিলাফত ধারার বিকাশ ঘটে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গণি (রা.) এবং হযরত আলী (কা.) এর মাধ্যমে।

একদিকে রহমতুল্লিল আলামীনের সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী রহমতের ধারা, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র মেরাজ বা দিদার প্রাপ্ত, নবী আখেরুজ্জামানের ওফাতের পর এই রহমত ও বেলায়তের যুগলধারার কেন্দ্রবিন্দু হন হযরত আলী (কা.)। এ ধারা প্রবহমান থাকে তদীয় আহলে বাইত, আসহাবে সুফ্‌ফা এবং অসংখ্য সুফি সাধকের মাধ্যমে। বিশ্বনবী (দ.) কর্তৃক হযরত আলী (কা.) সমীপে সমর্পিত বেলায়তী ধারায় কালক্রমে দুইজন গাউসুল আ'যমের আবির্ভাব ঘটে:

(১) গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) (১০৫১–১১৪২)

(২) গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮২৬–১৯০৬)

কাদেরীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক হযরত আবদুল কাদের জিলানীর কাদেরীয়া ত্বরিকার আধ্যাত্মিক ধারাকে ধারণ করে কালের বিবর্তনে আবির্ভাব ঘটে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর। তিনি তাঁর মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার 'সপ্ত পদ্ধতি'র মাধ্যমে আশরাফুল মাখলুকাত আদম সন্তানদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মৌলিকভাবে 'ইনসানে কামেলে' উন্নীত করার শিক্ষা-দীক্ষা দান করেছেন। গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী, তাঁর প্রবর্তিত কাদেরীয়া ত্বরিকায় মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টির প্রতিই প্রাধান্য দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী, যাঁর সময়কাল ছিল ইংরেজ বেনিয়া শাসন ব্যবস্থার বৈরী পরিবেশে, যে কারণে তিনি তাঁর প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারিপার্শ্বিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাই তাঁর ত্বরিকায় অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেমবাদের বাণীই মুখ্য।

আহমদিয়্যুল ও মোহাম্মদিয়্যুল মশরব

হযরত আহমদ মুজতবা, মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট থেকে দুটো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হয়েছিল একটি নবুয়ত অপরটি বেলায়ত এবং তাঁর সত্তায় এ দুটো পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মেরাজ শরিফের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করে মুক্ত খোদা মিলনপথ আবিষ্কার করে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মহান সংযোগ পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যার ফলে

সকল নবী, অলি, জ্বীন মানব তাঁর উম্মতে শামিল হতে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানায়। এ নেয়ামতের নাম 'সুন্নতে ওজমা'। নবী করিম (দ.) এর দুটো নাম একটি 'আহমদ' অপরটি 'মোহাম্মদ'। আহমদ সৃষ্টির আদিতে গুপ্ত, সুক্ষ্ম জগতে সৃষ্টি রহস্যের মূলাধার রূপে বিরাজমান ছিল। মোহাম্মদ (দ.) বিশ্বজগতে মঙ্গলময় ত্রাণকর্তারূপে বিকাশ লাভ করেন। এ নামদ্বয়ের প্রভাবে সমস্ত নবী ও অলি আহমদি ও মোহাম্মদি এই দুই মশরবে বিভক্ত। কুত্‌বিয়তের উৎস আহমদিউল মশরব এবং গাউসিয়তের উৎস মোহাম্মদিয়ুল মশরব।

আদেশ-নিষেধ অপেক্ষা অধিকতর রহস্য-প্রধান আহমদিউল মশরবের বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান, দর্শন যুক্তির প্রাধান্যই মোহাম্মদিয়ুল মশরবের বিশেষত্ব।

গাউসুল আযম এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ সময়ের আবর্তন-বিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক ও গতানুগতিকভাবেই মানুষ দ্বীনধর্ম, হাল জজ্‌বা, খোদায়ী ভাব বিভোরতা থেকে দূরে সরে পড়ার প্রেক্ষিতে এবং একইসাথে যাঁরা দ্বীন-ধর্মের প্রতি আসক্ত ছিল তাঁরাও নানারকম এখতেলাফ সম্বলিত মজহাবী ঝগড়া ও বাহ্যিক প্রচারণার দরুন বেলায়তে ওজমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে। এ রূপ পারিপার্শ্বিকতায় বিশ্ববাসী একজন খোদায়ী ব্যক্তিত্বের রূহানীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য প্রতিক্ষা করছিল। এ সময় হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে পীরানে পীর দস্তগীরের (৪৭১–৫৬১ হিজরী) আবির্ভাব ঘটে। সুফি পরিভাষায় এ রূপ মহিমাময় ব্যক্তিত্বকে বলা হয় 'গাউসুল আযম'। প্রথম গাউসুল আযম রূপে তিনি ইসলামী জগতে সর্বজনস্বীকৃত। এ ভুখন্ডে তিনি 'বড়পীর' নামেই সুপরিচিত। গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) ওফাতের পর দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর সময়ের দূরত্বের দরুণ এবং একইসাথে মুসলিম হুকুমতের পতন ও বৃটিশ হুকুমতের পত্তনের ফলে বৈরী পরিবেশে রূহানীশক্তিসম্পন্ন মহামানবের আবশ্যকতা প্রকট হয়ে উঠে। তৎপ্রেক্ষিতেই হিজরী ১২৪৪/১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আবির্ভাব।

মাইজভাণ্ডার নামকরণ

মগরাজাদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে রসদ প্রভৃতি সরবরাহের মধ্যকেন্দ্র (ফার্সি: মাইজ+ভাণ্ডার) হিসেবে ব্যবহৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার এ মাইজভাণ্ডার গ্রাম। এ মাইজভাণ্ডার গ্রামে জন্ম বলে গাউসুল আযম মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ নামের সাথে যুক্ত হয় 'মাইজভাণ্ডারী' এবং তাঁর

ত্বরিকার নামকরণও হয় এলাকার বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত পরিচিতির ভিত্তিতে 'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা'। কালক্রমে গ্রাম মাইজভাণ্ডার আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের, রূহানী প্রাণশক্তির মধ্যভাণ্ডার বা মাইজভাণ্ডারে পরিগণিত হয়ে পূর্ণ ঠিকানা লাভ করে।

সমাজ জীবনে সুফি সভ্যতার মৌলিক অবদান

দৈনন্দিন জীবনাচরণে নিত্যপ্রয়োজনীয় চিন্তা, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থেকে অল্পে সন্তুষ্টির সুফিদর্শন মানুষকে ঝামেলা ও মানসিক চাপমুক্ত অবস্থায় মানসিক প্রশান্তিতে নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতে সমর্থ। এর ফলে বিশ্ববাসীর অপ্রয়োজনীয় ধনসঞ্চয়ের অপরিণামদর্শী অসুস্থ চিন্তা ও মোহ লোপ পেয়ে ধনকেন্দ্রিক ব্যবস্থা শিথিল হবে। ফলে ধনকেন্দ্রিক জাগতিক প্রতিযোগিতাও হ্রাস পাবে।

কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খরচের উচ্চমান অর্জনের অপ্রতিরোধ্য লালসাই মানবগোষ্ঠীকে অতি রোজগারের নেশায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনী ও নিত্য মানসিক অস্থিরতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। এতে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ নয়; সামগ্রিকভাবে মানবজাতি নৈতিক বিবেচনাবোধ, বিচারবুদ্ধি, ধর্ম-অধর্ম চূড়ান্ত পরিণামের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে রীতিমতো অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিত্য অতৃপ্ত কামনা বাসনার পঙ্কিল স্রোতে নিশ্চিত বিপর্যয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এ বিপর্যয় থেকে মুক্ত থাকার বিশ্বস্ততম প্লাটফরমই সুফিদর্শন।

তাসাওউফ এর জীবনঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

জাগতিকভাবে চলমান মানব জীবনে প্রত্যেকের শারীরিক সুস্থতা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশ যেমন অপরিহার্য; তেমনি একইসাথে মানসিক সুস্থতা এবং মনন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুষ্ঠুতা ও স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে মানসিক উৎকর্ষতার দিকটি বিভ্রান্তিতে পড়ে পরিণামে তাকে ধার্মিকতার পরিবর্তে ধর্মান্ধ বা ধর্মীয় গোঁড়ামী এমনকি ধর্মহীনতার দিকে নিপতিত হতে হয়।

তাসাওউফ হলো রূহানী জিন্দেগীর দর্পণ বিশেষ। এ রূহানী জিন্দেগী এমন এক জিন্দেগী, যার ধ্যান-ধারনা, অনুশীলন মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে চিনতে সহায়তা করে দুনিয়া কী বস্তু এবং মানুষ ও দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? এ রূহানী জিন্দেগীর পূর্ণতা মানবীয় সত্তাকে স্রষ্টার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় এবং উর্ধ্বতন যে সত্য বস্তু আছে তার সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সর্বোপরি নিজ সম্বন্ধে অনুভূতি জাগ্রত করে দেয়। যে অনুভূতি সকল সন্দেহের অতীত ও উর্ধ্বে।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা

ইসলাম ধর্মের সাধন-মার্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সুফিতাত্ত্বিক সাধনা তথা সুফিবাদ। এই সুফি সাধনারই একটি বিশেষ ধারা– মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা।

সুফিবাদের ক্রমবিকাশের ধারায় বহু শ্রেণী বা ত্বরিকতে এটি বিকাশ লাভ করেছে। এর মধ্যে চার প্রকারের ত্বরিকা ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। এগুলো হল: কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দুটো ত্বরিকা তথা কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়াসহ মওলবীয়া ত্বরিকার বৈশিষ্ট্যের আলোকে যুগ চরিত্রের ভিত্তিতে উদ্ভূত বাংলাদেশের মাটিতে প্রচারিত বেশ আলোচিত, এক জনপ্রিয় ত্বরিকার নাম মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা মূলত সিলসিলায়ে ত্বরিকায়ে কাদেরীয়া তথা কাদেরীয়া ত্বরিকারই একটি ধারাবাহিক রূপান্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত এ দেশীয় মহান সুফিসাধক, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার মাইজভাণ্ডার গ্রামের মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কাদেরীয়া ত্বরিকার এই সিলসিলা বা ধারাকে এই দেশের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে চিশ্‌তীয়া ও মওলবীয়া ত্বরিকার ধারায় আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকে সাধনার অঙ্গীভূত করে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেন। ফলে এটি একটি প্রায় নতুন ত্বরিকা হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে উঠে। বলাবাহুল্য, শতাধিক বছরের স্বতন্ত্র পথ-পরিক্রমায় বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র ত্বরিকা হিসেবেই সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচারের বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে এই ত্বরিকায় বর্ণিত বিষয় ও রূপরেখা সাধারণের মধ্যে বড় বেশি স্পষ্ট ছিল না। ছিল না তেমন কোন সর্বজনীন লিখিত রূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬–১৯০৬) নিজে কোন বই-পত্র বা কিতাব লিখে যাননি, এমনকি তাঁর খলিফায়ে আযম হযরত বাবাভাণ্ডারীও (১৮৬৫–১৯৩৭) থাকতেন সারাক্ষণ নির্বাক 'হালে'। তাই ব্যঞ্জনাধর্মী, রহস্যাবৃত, মহাসমুদ্ররূপী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে জানার ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল প্রচুর। এমতাবস্থায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পৌত্র, বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গবেষক ও লেখক তদীয় স্থলাভিষিক্ত ও গদীনশীন পুত্র বংশীয় একমাত্র আওলাদ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩–১৯৮২) সর্বপ্রথম লিখিতভাবে ত্বরিকার রূপরেখা জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস পান। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ব্যঞ্জনাধর্মী রহস্যাবৃত বাক্য ও কর্মকাণ্ডসমূহের আভরণ ও আবরণ উন্মোচন করে ছোট বড় বারটি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচনকারী, অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

তাঁর ‘বেলায়তে মোত্‌লকা’ গ্রন্থে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে– ‘ত্রিবিধ বেলায়তী ধারা, নবুয়তী ধারার সমন্বয়ে, অর্থাৎ জাহের বাতেন তালীমে ইরশাদীসহ শরিয়ত, ত্বরিকত, মারিফত ও হাকীকত প্রভাবে ও সংমিশ্রণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকারূপ মহাসাগরের উৎপত্তি।’

অতঃপর অন্যান্য ত্বরিকার সাথে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে বলেছেন–

‘মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সমস্ত ত্বরিকার সমাবেশ ও সর্ববেষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, তৈফুরীয়া, জোনাইদিয়া ইত্যাদি ত্বরিকার অন্তর্ভুক্ত।’

মহাসাগররূপী এই ত্বরিকার প্রায়োগিক বর্ণনায় তিনি যে থিসিস উপস্থাপন করেছেন তা জনসমক্ষে মাইজভাণ্ডারী ‘সপ্তকর্ম পদ্ধতি’ নামে পরিচিত ও প্রচারিত। ‘সপ্তকর্ম পদ্ধতি’, সংক্ষেপে ‘সপ্ত পদ্ধতির’ রূপরেখা নিম্নরূপ–

১। ফানায়ে সালাসা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর।

২। মউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু।

ত্রিবিধ রিপুর বিনাশ স্তর এবং চতুর্বিধ মৃত্যুস্তরের সমন্বিত রূপই ‘সপ্তকর্ম পদ্ধতি’।

ফানায়ে সালাসা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ

১. ফানা আনিল খাল্ক, ২. ফানা আনিল হাওয়া, ৩. ফানা আনিল এরাদাঃ

১. **ফানা আনিল খাল্কঃ** কারো নিকট কোন উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। এর ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং স্বীয় শক্তি-সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

২. **ফানা আনিল হাওয়াঃ** যা না হলে চলে সে রূপ কাজ ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। এর ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়।

৩. **ফানা আনিল এরাদাঃ** আল্লাহ্‌র ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করে দেওয়া।

মউতে আরবা বা চতুর্বিধ মৃত্যু

১. মউতে আবইয়াদ, ২. মউতে আসওয়াদ, ৩. মউতে আহমার, ৪. মউতে আখদার।

মউতে আবইয়াদ (সাদা মৃত্যু): উপবাস এবং সংযমের মাধ্যমে এটি আয়ত্ত হয়। এর ফলে মনের ঔজ্জ্বলতা বাড়ে।

মউতে আসওয়াদ (কাল মৃত্যু): সমালোচনা, শত্রুর শত্রুতা এবং নিন্দাকে সহজভাবে নিয়ে আত্মশুদ্ধি এবং খোদার কাছে শোকরিয়ার মাধ্যমে এটি আয়ত্ত হয়।

মউতে আহমার (লাল মৃত্যু): কামভাব এবং লালসা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে পারলে এটি অর্জন করা যায়। এটি অর্জনে সক্ষম হলে অলীয়ে কামেলের দরোজায় পৌঁছানো যায়।

মউতে আখদার (সবুজ মৃত্যু): নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়। এই অর্জন বেলায়তে খিজরীর প্রবেশক বলে বিবেচিত। (বেলায়তে মোত্‌লাকা পৃ. ৭৭)

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক এবং স্বরূপ উন্মোচনকারী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী সপ্তকর্ম পদ্ধতির এই রূপরেখা বর্ণনার পাশাপাশি সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এর যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য– 'এই কুরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ সরল স্বাভাবিক পন্থা, যা জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ আনয়ন করে। এই সপ্ত পদ্ধতিতে ইসলামী সুফি মতবাদ মতে 'ফানায়ে নফ্‌সী' প্রবৃত্তির বিনাশ এবং বাকাবিল্লাহ্‌র বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত। এই পদ্ধতি কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী। এটা ব্যবসায়ী পীরত্বের সমর্থক নয় বরং নেহায়ত নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এই পীরী ব্যবসায়ীয় পতন যুগে এটা নৈতিক ধর্মের জীবনদানকারী ধ্রুবতারা। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা গতানুগতিক সুফি মতবাদে এক যুগোপযোগী সংস্কার।'

'সুফিবাদের যুগোপযোগী সংস্কার' মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আলোচনায় সমগ্রভাবে এর যে মৌলিক বিশেষত্বগুলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাকে একসূত্রে গ্রথিত করলে দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১. আশরাফুল মখলুকাত– মানব শ্রেষ্ঠত্ব
২. তাওহীদে আদিয়্যান– একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্ববাসীদের ধর্মীয় সহাবস্থান অর্থে ধর্ম পালনে সকলের সমানাধিকার
৩. আদলে মোত্‌লক– বিচারসাম্য
৪. বেলায়তে মোত্‌লকা– অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেমবাদ
৫. হেকমতে খিজরি– রহস্যময় কৌশল
৬. উসুলে সাবআ– বা সপ্ত পদ্ধতির বিশ্ব ব্যবস্থা।

(মূল তথ্য সূত্র: 'বেলায়তে মোত্‌লকা', সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, ভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম)

ফজিলতে রব্বানী ও কারামত প্রসঙ্গ

হযরত আদম (আ.)কে আল্লাহ্ সমস্ত নামাবলীর জ্ঞান দান করে জ্ঞানী রূপেই তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। তদ্‌রূপ যুগে যুগে সমস্ত গুপ্ত-ব্যক্ত খোদায়ী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও আল্লাহর খলিফা এবং মহানবী (দ.) এর নায়েব বা প্রতিনিধি। অলি আল্লাহ্‌গণ, যাঁরা ফজিলতে রব্বানী প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার ক্ষমতা ও জ্যোতি আহরণকারী তাঁদের দর্শন, তাঁদের কারামত দর্শন আল্লাহ্ তা'য়ালার আয়াতের ও বুজুর্গীর প্রত্যক্ষ দর্শন বটে।

ফজিলতে রব্বানী ও সুনেতৃত্ব প্রসঙ্গ

এ জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাঁর ব্যক্তিত্ব আছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যক্তিত্বকেই বলা হয় 'খেলাফতে উলুহীয়াত'। বলাবাহুল্য, এঁরাই নেতৃত্বের উপযোগী এবং খোদা অনুসন্ধিৎসু মানবের দিশারী। দেশ, জাতি বা সমাজে যাঁরা উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীন তাঁরাই উন্নত ও সম্মানিত। অতএব প্রত্যেকের প্রতি ওয়াজেব যুগের নীতিবাহক নবী-অলী বা মোজাদ্দেদে জমানদের নীতি মেনে তাঁদের নেতৃত্বাধীন থেকে নিজেকে মানবতার উচ্চ শিখরে উন্নীত করা।

মাইজভাণ্ডারী সপ্ত পদ্ধতি

আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে, আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যেই ইনসানে কামেলের সত্তা অন্তর্নিহিত। হৃদয়কন্দরে সুপ্ত এ পবিত্র পরম সত্তা প্রায় ক্ষেত্রে সুপ্তই থেকে যায়। এ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পবিত্র গুপ্ত-সুপ্ত সত্তাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত এবং পরিপূর্ণ মাত্রায় যথাযথভাবে পরিচর্যা করতে পারলে তা উজ্জীবিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সপ্ত পদ্ধতি এ প্রক্রিয়াকে অনুশীলন ও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়ার একটি পরীক্ষিত কার্যকর কালোপযোগী হাতিয়ার।

চলমান সমাজ বাস্তবতায় সপ্ত পদ্ধতির অপরিহার্যতা

চলমান সমাজে যেহেতু সৎ-অসৎ বস্তুর তুলাদণ্ড বিচার কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ এবং বর্তমানে অতি কামনার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর যুগে কঠোর সাধনা বা ইবাদতও বাস্তবে সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে, এমতাবস্থায় এ সপ্ত পদ্ধতি সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে। একই সাথে পরের দুঃখ-কষ্টের কারণ না হয়ে উপরন্তু বন্ধুসুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়।

এ সপ্তপদ্ধতি ইসলামী সুফি মতবাদ মতে ‘ফানায়ে নফ্সী’ প্রবৃত্তির বিনাশ এবং ‘বক্বাবিল্লাহ্র’ বিভিন্ন উসুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলা মুক্ত।

পবিত্র হাদিসের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে ‘কাউকাবুদ দুর্‌রী’ জীবনের ধ্রুবতারা, এটা সেই ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী, ব্যবসায়ী পীরত্বের বিপরীতে নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এক কথায়, এ পীরী ব্যবসাদারী পতনযুগে এটি স্বচ্ছ নৈতিক ধর্মের জীবনদানকারী।

শরিয়ত মারফতের সমন্বয়কারী হিসেবে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভূমিকা

কুরআন সুন্নাহ্ ও শরিয়তের দৃষ্টিতে মাইজভাণ্ডার শরিফ

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাশক্তিতে তাঁর ত্রাণকর্তৃত্বের প্রভাবে সর্বস্তরের মানুষকে আল্লাহ্র পথে ধাবিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে এরই অনুষঙ্গ হিসেবে স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচারে আবির্ভূত হন। এই মাহাত্ম্য প্রচারের অন্যতম অনিবার্য ফসল হিসেবেই প্রকাশ পায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারামত। গাউসুল আযম রূপে তাঁর ত্রাণকর্তৃত্বের সর্বাধিক আলোচিত কারামত প্রকাশ পায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে ৪২ মাইল দূরে বাঘের মুখে লোটা মেরে ভক্ত উদ্ধারের ঘটনায়। রাতারাতি ব্যাপক সাড়া জাগানো এ কারামত সহ ছোটবড় অজস্র কারামত প্রকাশের ঘটনায় সাধারণ থেকে উচ্চশিক্ষিত, ছাত্র-শিক্ষক, আলেম ফাজেল সমকালীন সমাজ জীবনের প্রায় সকলেই তাঁর দরবারে আসা যাওয়া শুরু করেন প্রায় অহোরাত্র।

শরিয়তি কর্মকান্ডের চলমান স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এ কারামতের কারণে মানুষের ঢল দেখে সাধারণ্যে কিছু ভুল ধারণার উদ্রেক হয়। যেমনঃ মাইজভাণ্ডারে গেলে নামায-রোজা-কুরআন তেলাওয়াতের প্রয়োজন পড়েনা, পীরই সকল সমস্যার সমাধান করে দেন। ইত্যবসরে মুক্তিকামী ধর্মপ্রাণ মানুষের সহজ আবেগ প্রবণতাকে পুঁজি করে অলস, নিষ্কর্মা, কুমতলবের কিছু মানুষ এ পরিমন্ডলে ঢুকে পড়ে নিজেদের চরিত্র দোষ ঢাকা এবং সুক্ষ্ম প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে এ কল্পিত ও বানোয়াট ধারণাকে ফুলে ফলে পল্লবিত করে তা প্রকাশ করতে থাকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাইজভাণ্ডারের মাহাত্ম্য নিহিত পবিত্র ইসলামধর্মের শরিয়তি বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে মানসিক উৎকর্ষতার একটা পর্যায়ে ত্বরিকতের সুক্ষ্ম কর্মকান্ডে প্রবেশ এবং মারফতের উচ্চতর স্তরে উত্তরণের অবিরত প্রক্রিয়ায় মাইজভাণ্ডারী সপ্তপদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে ইনসানে কামিলে উন্নীত হয়ে আল্লাহ্র জাতে মিলনের চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায়। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সপ্তপদ্ধতি ছাড়াও স্বয়ং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র পূর্বপুরুষের সুদীর্ঘ শরিয়তি ঐতিহ্য, স্বীয় শিক্ষা, কর্ম ও

আধ্যাত্মিক জীবনসহ সামগ্রিক দর্শন ও জীবনাদর্শেও কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে শরিয়তি চরিত্র সতত: দৃশ্যমান।

নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি বিষয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অবস্থান পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় তাঁর পবিত্র কালামের মধ্যে: "সালাতুত্ তসবীর নামায পড়িও, তাহাজ্জুদের নামায পড়িও, কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করিও।" বলাবাহুল্য, শরিয়তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যাঁরা অভ্যস্ত এবং পরিপূর্ণমাত্রায় মনোযোগী তাঁরাই উল্লিখিত বাড়তি নামাযগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। কারণ এ প্রক্রিয়াটা যতটুকু না উপদেশের, তার চেয়ে ঢের বেশী আত্ম উপলব্ধি ও অনুশীলনের।

এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ব্যক্তিজীবনে কুরআন-সুন্নাহ্ ও শরিয়তি ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটের বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য:

১. তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন গৌড় নগরের বিচারালয়ের শরিয়তি ইসলামী বিধানের বিচারক (কাজী)।
২. তাঁর অন্যতম পূর্বপুরুষ সৈয়দ আবদুল কাদের মূলত মসজিদের ইমামতি উপলক্ষেই মাইজভাণ্ডার গ্রামে আসেন স্থায়ীভাবে।
৩. এই ইমাম আব্দুল কাদেরের প্রপৌত্র সৈয়দ মতিউল্লাহ্ ছিলেন পরিপূর্ণ দ্বীনদার শরিয়তি ব্যক্তিত্ব।
৪. সৈয়দ মতিউল্লাহ্ পুত্র সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ পূর্বপুরুষের এ ঐতিহ্য ধারণ করেন যথাযথভাবে এবং এ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রবর্তন করেন।
৫. তিনি ছাত্রাবস্থায় শরিয়তি বিধি-বিধান মতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন মর্যাদাপূর্ণভাবে।
৬. শিক্ষাজীবন শেষে পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্যিক ধারায় শরিয়তি বিধি বিধানের কাজী'র চাকুরীতেও যোগদান করেন যশোহরে।
৭. স্বেচ্ছায় কাজীর পদ ছেড়ে দিয়ে মাদ্রাসায় প্রধান মোদার্রিস হিসেবে যোগদান করেন কলিকাতায়।
৮. চট্টগ্রাম অঞ্চলেও সমকালে তাঁর শরিয়তি ফতোয়া ছিল আলেম সমাজের কাছে মর্যাদাপূর্ণভাবে গ্রহণীয়।
৯. শরিয়তি বিধি-বিধান, মাসআলা ইত্যাদি বিষয়েও আলেম সমাজ সর্বাগ্রে ছুটে আসতেন তাঁর কাছেই।
১০. তাঁর সমসাময়িক কালে তাঁর দস্তখত বা অনুমোদন ছাড়া শরিয়তি কোন ফতোয়াই গ্রহণযোগ্যতা পেত না। কুরআন সুন্নাহ্ কেন্দ্রিক এই সুদীর্ঘ শরিয়তি ঐতিহ্যকে

ধারণ, লালন ও প্রতিপালন এবং স্বীয় অর্জনকে সম্বল করে শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী শরিয়তের পথে আল্লাহ্‌কে ডাকার পাশাপাশি শরিয়তের প্রলম্বিত বা বিস্তৃতরূপ ত্বরিকতের স্তরে উঠে মানুষকে আল্লাহ্‌র জাতে মিলিয়ে দেওয়ার মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বলাবাহুল্য, এ ধারা শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা শরিয়ত-বহির্ভূত নতুন কোন কিছু নয়, বরং যথার্থ শরিয়তি কর্মকাণ্ডের পরিপূর্ণতারই অনিবার্য অনুষঙ্গ। আর মাইজভাণ্ডারী সপ্ত পদ্ধতি হলো শরিয়তের পথে ত্বরিকত, মারিফত ও হাকিকতে পৌঁছার অন্যতম অনিবার্য সোপান মাত্র।

শরিয়তি কর্মকান্ডের প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ত্বরিকতের উন্নততর প্রক্রিয়ায় উত্তরণের পথে মাইজভাণ্ডারের ব্যাপক সাড়া জাগানো আধ্যাত্মিক মহিমা নিয়ে শুরু থেকেই জেনে-না জেনে, বুঝে-না বুঝে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়, যার কোন মৌলিক ভিত্তি ছিলনা। তাই এ ক্ষেত্রে অহেতুক তালগোল না পাকিয়ে শরিয়ত থেকে ত্বরিকতে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি মৌলিকভাবে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনাই মুখ্য এবং অবিসংবাদিত ভাবে গ্রহণযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে বৃটিশ আমল এবং সমকালের দুইজন স্বনামধন্য শরিয়তি আলেম, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দুইজন ইমামের সুচিন্তিত অভিমত বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

মাশরেকি পাকিস্তানের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা শরিয়তি ধারায় সুন্নিয়তের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম এবং কুরআন-সুন্নাহ্ বিষয়ে প্রচুর পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রয়োজনেই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জিয়ারত করতেন নিয়মিত। শুধু তাই নয়; তিনি আলোচনা, বিবৃতি, অনলবর্ষি বক্তৃতা ও ওয়াজ মাহফিলের পাশাপাশি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সু সমন্বিত ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমেও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মহিমার প্রশংসা করতেন মুক্তকণ্ঠে। (তাঁর যাবতীয় প্রকাশনা, বিশেষত দিওয়ানে আজিজ কিতাবটি এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।)

সম্প্রতিকালের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বহু গ্রন্থের প্রণেতা অবিসংবাদিত ইসলামী পণ্ডিত ও শরিয়তি ব্যক্তিত্ব আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী তাঁর জীবন অভিজ্ঞতায় মাইজভাণ্ডারের আধ্যাত্মিক মহিমা, ত্বরিকতের উচ্চমার্গীয় অবস্থানের পাশাপাশি মৌলিক ও সুনির্দিষ্টভাবে এ ত্বরিকার শরিয়তি অবস্থানটি চিহ্নিত করেছেন, শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একান্ত সচেতনতায়, ঐতিহাসিক দায়িত্বশীলতার সাথে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, মাওলানা হাশেমী তাঁর স্বীয় ঈমানী দায়িত্ব পালনেরই অংশ হিসেবে এ ঐতিহাসিক কাজটি করেছেন। তাঁর এ যুগোপযোগী ধর্মীয় দায়িত্বশীল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সচেতন পর্যবেক্ষণটি শরিয়ত ও

ত্বরিকতের নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌র জাতে মিলনের পথ-পরিক্রমায় তথা 'চূড়ান্ত মুক্তির' ক্ষেত্রে পবিত্র মাইজভাণ্ডারের শাশ্বত অনন্য অবদানের বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সুন্দর এবং মর্যাদাপূর্ণভাবেই ফয়সালা করে দিয়েছেন। মাওলানা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমীর ভাষায়–

"মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আদর্শ ও দর্শনের অবস্থান শরিয়তি সীমানার বাইরে নয়। সত্যিকার অর্থে এটি একটি মানবতাবাদী দর্শন। সত্যসন্ধানী সকল মানুষ এ দর্শনের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজে পায়।" (গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী: শতবর্ষের আলোকে, পৃ. ২৫২)

বলাবাহুল্য, সামগ্রিক অর্থে মাইজভাণ্ডারের ইতিহাসেও এ ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ফয়সালা রীতিমতো একটি মাইলফলক।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

পবিত্র ইসলাম ধর্মের হাজার বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ত্বরিকার উদ্ভব ঘটেছে। এর মধ্যে একজন বাঙালি সুফিসাধক কর্তৃক বাংলার মাটিতে প্রবর্তিত একমাত্র ত্বরিকা হলো মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা।[১] চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার মাইজভাণ্ডার গ্রামে এই ত্বরিকার প্রবর্তক মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (১৮২৬–১৯০৬) জন্ম। মাইজভাণ্ডার গ্রামে জন্ম বলে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয় 'মাইজভাণ্ডারী' এবং তাঁর ত্বরিকার নামকরণও হয় "মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা"[২]।

জন্ম ও শিক্ষা

শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১২৩৩ সালের ১ মাঘ বুধবার মাইজভাণ্ডার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ্ এবং মাতা বিবি খায়েরুন্‌নেছা। ফটিকছড়ির স্থানীয় মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি শহর কোলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসা 'কোলকাতা আলীয়া বিশ্ববিদ্যালয়' নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে প্রতিবছর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পঞ্চাশ রূপী বৃত্তি নিয়ে তিনি দীর্ঘ আট বছর এই মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কামিল ডিগ্রী হাসিল করেন। [সূত্রঃ তারিখে মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, আলিয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা এবং মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।]

অতঃপর অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলায় বিচার বিভাগে কাজী পদে যোগদান করেন। এ সময় পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজনে মুন্সেফী পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইতোমধ্যে কোলকাতায় মুন্সী বো-আলী মাদ্‌রাসায় প্রধান মোদার্‌রিসের পদ খালি হলে তিনি জাগতিকভাবে লোভনীয় কাজী পদে ইস্তফা দিয়ে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রধান মোদার্‌রিস হিসেবে এবং পরবর্তী সময়ে কোলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩]

অধ্যাত্ম জীবন

কোলকাতায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে তিনি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মহান আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের অন্তর্চক্ষুতে ধরা পড়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন।

এ পর্যায়ে প্রথমে সৈয়দ আবু সাহমা মোহাম্মদ সালেহ লাহোরী আল কাদেরী (র.)'র নিকট মুরাদ প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীকালে তদীয় বড় ভাই সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ (র.)'র খেদমতে গিয়ে তোয়াজ্জু প্রাপ্ত হন। এই ভাবে তিনি দুই মহান অলি আল্লাহ্‌র অশেষ ফয়েজ রহমতে অভিষিক্ত হন।

বাইয়াত গ্রহণের পরবর্তী পাঁচ বছর পীরের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করার পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি অহর্নিশ ইবাদত ও সিয়াম পালনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে তদীয় মাতার আহ্বানে স্বগ্রাম মাইজভাণ্ডারে ফিরে এসে মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছায় সংসার ধর্মে সম্মতি প্রদান করেন। অতঃপর স্বগ্রাম মাইজভাণ্ডারে বসেই ত্বরিকতের সাধনা ও কর্মকাণ্ড চালাতে থাকেন।

নিদর্শন, মো'জেজা ও কারামত

পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলদের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে জানা যায়, যখন কোন নবী-রাসূল নিজেকে আল্লাহ্‌র নিয়োজিত নবী-রাসূল হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন, তখন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি এই দাবী উত্থাপিত হত যে, আপনি যদি সত্যিই নবী-রাসূল বা আল্লাহ্ কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তা হলে আপনি একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক; সুতরাং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করুন। জনসাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ যে সব অলৌকিক কাজ করেছেন পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাঁকে বলা হয়েছে, 'নিদর্শন'।

এই নিদর্শনকেই তাসাওউফের পরিভাষায় 'মো'জেজা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মূলত আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা যখন নবী-রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় 'মো'জেজা', আর যখন এ ক্ষমতা কোন অলি-দরবেশ কর্তৃক প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় 'কারামত'। আরবি 'কারামত' শব্দের বাংলা অর্থ অসাধারণ শান্তি তথা অলৌকিকত্ব। অলি-দরবেশগণ তাঁদের জীবনের সকল মোহমায়া ত্যাগ করে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আজীবন কঠোর কঠিন সাধনায় ব্রত হয়ে অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেন। এ সব অলৌকিক এবং আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনাবলীকে বলা হয় 'কারামত'।

বলাবাহুল্য, এ অলৌকিক কর্মকান্ড প্রকাশের বিষয়টি মৌলিকভাবে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আকর্ষণ এবং ধাবিত করার একটা পরিকল্পিত খোদায়ী কৌশল মাত্র; সুতরাং কারামত সমূহ এ প্রেক্ষাপটেই বিচার্য।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কারামত

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বড় কারামত হল, তাঁর বংশধারায় কামেল আওলাদ এবং অগণিত ইনসানে কামেল খলিফার সৃষ্টি। তাঁর অজস্র কারামতের মধ্যে সিংহভাগই অলিখিত – ওরাল ট্র্যাডিশানে আশেক ভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত ও প্রচারিত। বলাবাহুল্য, এগুলোর লিখিতরূপ কোথায় কিভাবে আছে কিংবা আদৌ আছে কিনা আশেক ভক্তদের মধ্যে কেউ তা চিন্তাও করে না। এই প্রেক্ষাপটে মূলত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী গ্রন্থে এবং অংশত 'বেলায়তে মোত্‌লকা' গ্রন্থে শ'খানেক ৯৪+৩=৯৭টি কারামত বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কারামত

বাঘের মুখে লোটা নিক্ষেপ – নিরাপদে ভক্ত উদ্ধার

একদিন হযরত কেবলা দরবার শরিফ পুকুর পাড়ে বসে ওজু করার সময় অকস্মাৎ বলে উঠলেন– "হারামজাদা তুই এখান থেকে দূর হস্‌ নাই।" জালালি হাল তথা আধ্যাত্মিক ভাব-বিভোরতায় একথা বলে হযরত কেবলা তদীয় ওজুর লোটাটি সজোরে পুকুরে ছুঁড়ে মারলেন। খাদেমগণ পুকুরে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এর কোন হদিস না পেয়ে চিন্তিত। সকলে এ আশ্চর্য ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

এর দুই দিন পর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী আছমত আলী নামক হযরতের এক ভক্ত কিছু তোহ্‌ফা সহ উক্ত লোটাটি সাথে নিয়ে হযরত কেবলার সামনে এসে ভক্তি ভরে এগুলো নিবেদন করে কেঁদে কেঁদে বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। অতঃপর আছমত আলী এই অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিলেন এভাবে–

"আমি হযরতের একান্ত ভক্ত। হযরতের জন্য কিছু নাস্তা বানিয়ে আনার জন্য রাঙ্গুনিয়ার কোদালা পাহাড়ে গিয়েছিলাম কাঠ কাটতে। কাঠ কেটে আঁটি বাঁধার সময় দেখি এক বিরাট বাঘ আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে আমার সামনে হাজির। আমি মরণ-ভয়ে 'ইয়া গাউসুল আযম' বলে চিৎকার করে উঠলাম। কী আশ্চর্য! 'ইয়া গাউসুল আযম' উচ্চারণের সাথে সাথেই হঠাৎ শূন্য থেকে একটি লোটা এসে সজোরে বাঘের মুখে আঘাত করে। বাঘটি ভয় পেয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যায়। আমি অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যাই। লোটাটি দেখেই আমি চিনে ফেলি। এটি হযরতের ওজুর লোটা।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে ঘটনাস্থল রাঙ্গুনিয়ার কোদালা পাহাড়ের দূরত্ব আনুমানিক ৪২ মাইল। দরবার শরিফের পুকুরে লোটা নিক্ষেপের মাধ্যমে চোখের পলকে ৪২ মাইল দূরত্বে হিংস্র বাঘের মুখ থেকে ভক্ত উদ্ধারের ঘটনাটি আজও ভাণ্ডারী আশেক ভক্তদের মুখে মুখে উচ্চারিত। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কামালিয়ত অর্জনের সূচনাপর্বের এই বহুল আলোচিত কারামতটি আজও কিংবদন্তিসম জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক প্রচারিত কারামত সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বলাবাহুল্য, দরবার শরিফ থেকে প্রকাশিত 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের প্রচ্ছদেও ব্যবহৃত হয়েছে এই কারামত সংশ্লিষ্ট ইলাসট্রেশান।

[মূলসূত্রঃ আয়নায়ে বারী। উদ্ধৃত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, পৃ. ১২৮]

(মূল লোটাটি গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের দূর্লভ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। দরবারে দৃশ্যমান যে লোটা তা এর রেপ্লিকা।)

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বাণী চিরন্তন

গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর ত্বরিকা প্রচারের সূচনাপর্ব থেকে বিভিন্ন সময় কখনো প্রসঙ্গক্রমে, কখনো একান্ত হালজজব অবস্থায় ত্বরিকাকে কেন্দ্র করে স্বীয় মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন বিভিন্নভাবে, নানা আঙ্গিকে। বলাবাহুল্য, তাঁর এই পবিত্র কালাম সমূহের মধ্যে নতুন ত্বরিকার প্রচারক হিসেবে জনসমক্ষে তাঁর স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং ত্বরিকার অনুসারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উপদেশই মুখ্য।

এই প্রেক্ষাপটে তাঁর পবিত্র কালামগুলোকে মূলত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে– (ক) স্বীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা (খ) অনুসারীদের প্রতি উপদেশ।

(ক) স্বীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা

১. রসূল (দ.) এর বেলায়তের দুটি টুপির মধ্যে একটি আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের মাথায় দিয়েছেন। আমার নাম পীরানে পীর সাহেবের সাথে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে।
২. আমি মক্কা শরিফ গিয়ে দেখলাম, রসূল করিম (দ.) এর সদর মোবারক [বক্ষস্থল] এক অনন্ত দরিয়া। আমি ও আমার ভাই পীরানে পীর সাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।
৩. আমিই হাশরের দিন প্রথম বলব– লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্।

৪. আমি মজ্‌জুবে মাহজ নই, মজ্‌জুবে সালেক হই; বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায পড়ি।
৫. আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ আর বারটি কাচারি আছে।
৬. আমার চারটি কুরসি, চারটি মজহাব ও চারটি ইমাম আছে।
৭. আমার চাদরের নিচে এসে দেখ; আসমান-জমিন, আরশ-কুরসি, লৌহ-কলম, বেহেশ্‌ত-দোযখ সব এক পলকে দেখিয়ে দেবো।
৮. আমি ছাগল দিয়ে বলদ দাবাই, ভেড়া দিয়ে ভইষ দাবাই, বানর দিয়ে বাঘ দাবাই।
৯. নিজের হাতে পাকিয়ে খেয়ো, পরের হাতের পাকানো খেয়োনা। আমি বারো মাস রোজা রাখি, তুমিও রেখো।
১০. তুমি আমার সামনে থেকেও যদি স্মরণ-বিচ্যুত হও তা হলে তুমি ইয়ামেন দেশে। আবার ইয়ামেন দেশে থেকেও যদি আমার স্মরণ-বিচ্যুত না হও, তবে তুমি আমার সামনে।
১১. যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে তাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করবো। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ চলতে থাকবে।

(খ) অনুসারীদের প্রতি উপদেশ

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তদীয় মুরিদ এবং আশেক ভক্তদের সাহায্য-সহযোগিতার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। এই সমস্ত উপদেশকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে–

১. নামায ও কুরআন তেলাওয়াতের হেকমত

বাণী: সালাতুত্-তসবীর নামায পড়বে, তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করবে।

২. হালাল খাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ

বাণী: ফেরেশ্‌তা কালেব বনে যাও।

বাণী: কবুতরের মতো বেছে খেয়ো, হারাম খেয়ো না। নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়ে খোদার প্রশংসা কর।

৩. আড়ম্বরহীন-কৃচ্ছ্রতা সাধনের উপদেশ

বাণী: দুনিয়া মুসাফিরের জায়গা, এখানে আড়ম্বরের দরকার কী?

বাণী: আমার ছেলেরা সবসময় রোজা রাখে।

৪. দরবার থেকে ফয়েয রহমত পাওয়ার নিয়ম বর্ণনা

বাণী: আমার নিকট একটি পাটি বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুলও কি নিয়ে আসতে পারনি?

৫. ফিত্‌রার মাসায়েল

বাণী: যে দেশে [যে অঞ্চলে] যেটি প্রধান খাদ্য, সেটি দিয়েই ফিত্‌রা দেওয়া যাবে।

৬. পরলোকগতদের স্মরণ করা

বাণী: মুরব্বীদের প্রতি সওয়াব পৌঁছানোর আয়োজন করা ভাল।

৭. পারিবারিক জীবনে আপোষ ভাব

বাণী: (এক ব্যক্তির নিজ ভাই কর্তৃক জুলুমের নালিশের প্রেক্ষিতে) সে হারামজাদা, তাকে কিছু বেশি দিয়ে আপোষ কর।

৮. তদীয় পৌত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ

বাণী: নবাব হামারা দেলাময়না [সৈয়দ দেলাওর হোসাইন] হ্যায়। ফের আওর কোন নবাব হ্যায়?

বাণী: তোম কোন্ সুলতান হ্যায়? সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়।

সাধারণত কোনো দরগাহ বা মাযারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত থাকে কোনো একক আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের সাথে। কিন্তু এক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ব্যতিক্রম। এখানে বংশ পরম্পরায় আধ্যাত্মিকতার ধারা বহমান। মূল ব্যক্তিত্বের পরে পরবর্তী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের নিয়েও গড়ে ওঠেছে প্রায় একই রকম আয়োজন। যেমন: স্বতন্ত্র মন্‌জিল ও মাযার, কারামত, খোশরোজ ও উরস, এমনকি স্বতন্ত্র ধারায় গান রচনাও। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাইজভাণ্ডার বলতে এই ত্বরিকার প্রবর্তকের পাশাপাশি শত বছরের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ধারা সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সমন্বিত রূপকেই বুঝিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই ধারা রক্তের সম্পর্ক বা ধারায় সীমাবদ্ধ থাকেনি : শতাধিক মাইজভাণ্ডারী খলিফাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে, এমনকি দেশের বাইরেও এ ধারা নতুন আঙ্গিক ও আয়োজনে প্রবহমান।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর পর এ ধারায় যাঁদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন–

১. হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৮৬৫–১৯০২)

২. হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (১৮৬৫–১৯৩৭)

৩. হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (১৮৬৬–১৯০৫)

৪. হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩–১৯৮২)

৫. হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯২৮–১৯৮৮)

এক নজরে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বিশেষত্ব

১. প্রাতিষ্ঠানিক দ্বীনি ও শরিয়তী শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষকতার মর্যাদা নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে চট্টগ্রামের সমাজ জীবনে সমীহ জাগানিয়া আত্মপ্রকাশ।

২. সমসাময়িক কালে তাঁর ফতোয়া ছিল সবার কছে মর্যাদাপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর দস্তখত ছাড়া এতদঞ্চলে কোন ফতোয়াই গ্রহণযোগ্যতা পেতনা।

৩. শরিয়তী বিধি-বিধান মাসআলা, ফতোয়া নিয়ে পরামর্শ, মাসআলা ইত্যাদির জন্য আলেম সমাজ তাঁর কাছেই ছুটে আসতেন সর্বপ্রথম।

৪. দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি যখন ত্বরিকা প্রচারের কাজ শুরু করেন তখন তাঁর অকল্পনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ও তাঁর ত্বরিকা 'জগতে মশহুর' হয়ে উঠে। তাঁর কারামত সমূহ মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। ফলে শরিয়তি, মারফতি আলেম সহ শতসহস্র আশেক-ভক্ত তাঁর দরবারে এসে ফয়েজ রহমত ও মনষ্কামনা নিবেদন শুরু করেন।

৫. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বাণী প্রচার-প্রসারের জন্য দেশ-বিদেশে শত শত 'কামেল সাগরেদ' (খলিফা) সৃষ্টি ও নিয়োজিত করে আবহমান ধারায় তা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থাকরণ।

৬. তাঁর ইঙ্গিতে তাঁকে কেন্দ্র করেই মাইজভাণ্ডারী সাধনার অনুষঙ্গ হিসেবে মাইজভাণ্ডারী গান রচনা ও সামার প্রচলন।

৭. তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা এবং সাড়া জাগানো আধ্যাত্মিক শক্তির চাঞ্চল্যকর হেকমতি কৌশলে স্থবির ও অনগ্রসর এবং অগ্রসর ও প্রাগ্রসর চলমান সমাজের দ্বীনি শিক্ষিত আলেম সমাজ ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বিশিষ্টজনদের এক দৃষ্টিআকর্ষণীয় ও উপভোগ্য দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে, তাঁর জীবদ্দশায় মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সমাজ জীবনে তার স্থায়ী আসন গেড়ে বসতে সক্ষম হয়।

৮. সর্বজনীন সুফি দর্শনকে যুগ উপযোগী করে উপস্থাপন।

৯. তিনি এমন এক যুগ সংস্কারক ইনসানে কামেল, খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে, তাঁর গাউসে আযমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়েছেন।

১০. তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করে, সকলের মনোবাসনা পূরণে দোয়া করেছেন এবং তাঁর দোয়া আল্লাহ্‌তায়ালা কবুল করেছেন। সেই অর্থে তিনি শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা মানব বা গাউসুল আযম।

১১. তাঁর জীবনাদর্শ, সপ্ত পদ্ধতির জীবনদর্শন, অমীয় বাণীগুলো পরনিন্দা বিহীন, ভাববাদী সুদূরপ্রসারী সর্বোপরি নৈতিক জীবন সমৃদ্ধকারী।
১২. তিনি বিপথগামী বিশ্ব মানবতার ত্রাণকর্তৃত্বসম্পন্ন মুক্তির পথ প্রদর্শক। যা মৌলিক মানবীয় চিন্তার সুস্পষ্ট বিকাশ এবং নিখুঁত ইসলামী নীতিরই সম্পূরক।
১৩. তাঁর সপ্তপদ্ধতির বেলায়ত রহস্য তাঁর বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসিয়তের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
১৪. কালের বিবর্তনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মে গোঁড়াবাদ থেকে রক্ষা করার জন্য এক বিরাট কার্যকরী রূহানী শক্তি এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহা কৌশল বা হেকমতের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সে কাঙ্ক্ষিত বিরাট শক্তির সূচনা হয় তাঁরই মাধ্যমে। এ মহা কৌশল বা হেকমতের নামই 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'।

---

১. ভারতবর্ষের বাংলা মুলুকে চারটি ত্বরিকা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও এগুলোর উদ্ভব এদেশের বাইরে। কাদেরীয়ার উদ্ভব ইরাকে, নক্‌শবন্দীয়া রাশিয়ায় (বর্তমান উজবেকিস্তান) এবং চিশ্‌তিয়ার বিকাশ ও মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকার উদ্ভব ভারতবর্ষে। এক্ষেত্রে বাংলার মাটিতে উদ্ভূত বলে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বতত: স্বীকার্য যা বিদ্বৎ সমাজের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।
২. মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৯।
৩. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ষোড়শ সংস্করণ) আন্‌জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ২০০৫।

পরবর্তীকালের সুফি সাধক
বেলায়তে মা'য়াব শাহ্‌জাদা-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক ফানা ফিল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৬৫–১৯০২]

আউলাদে রাসূল (দ.) মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ঔরসজাত একমাত্র পুত্রসন্তান হলেন, বেলায়তে মা'য়াব শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি ১২৮২ হিজরি–১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১৩ চৈত্র সন্ধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্রসন্তান–

(ক) সৈয়দ মীর হাসান মাইজভাণ্ডারী (১৮৯১–১৯০৬)

(খ) সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩–১৯৮২)।

খোদা তায়ালার ইচ্ছায় স্বীয় পিতা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী দুনিয়াবী হায়াতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়-ই তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ওফাতপ্রাপ্ত হন।

দুই সন্তানের জনক ৩৭ বছর বয়সের জিন্দেগী সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে বড় বেশি নেই। তবে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ১৯০৬ সালে রচিত এবং ১৯০৭ সালে প্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শী মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগীরির 'ওফাত নামা' নামক কবিতায় তাঁর জীবনের কিছু প্রত্যক্ষ তথ্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এইভাবে–

মির হোছনের[১] পিতা গাউছের প্রাণধন।
পূর্বে স্বর্গে চলি গেছে ছাড়িয়া ভূবন।।
আলেম[২] আমেল[৩] আর ফাজেল[৪], কামেল।[৫]
এক তোয়াজ্জায় মারফত[৬] কৈরাছে হাছেল।।
যুবা কালে রূপবন্ত বিদ্যার সাগর।
যেন ফলবন্ত বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।।
পুত্র কন্যা আটজন দিছে বিধাতায়।
সকল ঘরে এক পুত্র জীবিত আছয়।।
আর সপ্ত পুত্র কন্যা হইছে স্বর্গবাস।।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর “প্রাণধন” হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীর বাল্যজীবন, কৈশোর এবং শিক্ষাজীবন সর্বোপরি দরবারী পরিমণ্ডলে তাঁর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে পূর্বতন প্রত্যক্ষ তেমন কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও এ কবিতার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে তাঁর বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্ব। যেমন: পিতা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী থেকে তিনি তাওয়াজ্জু তথা সরাসরি আধ্যাত্মিক ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে মর্যাদাসম্পন্ন আমলকারী হিসেবে পূর্ণ কামালিয়ত অর্জন করেছিলেন।

তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মের সূত্রে অনুমিত হয় তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৮৯০ সালের প্রথমার্ধে সংসার জীবন শুরু করেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উদ্যোগে মির্জাপুরের হযরত মাওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ্ মির্জাপুরীর প্রথমা কন্যা সৈয়দা ওয়াজেদা বেগম-এর সাথে তাঁর বিবাহের আয়োজন করা হয়, যেটি ছিল মাহাত্ম্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাওলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ্ মির্জাপুরীর সাথে হযরত কেবলায়ে আলমের সম্পর্কের বিষয়টিও ছিল বহুমাত্রিক তাৎপর্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক মহিমায় ভাস্বর। যেমন: একইসাথে (১) খালাত ভাই (২) পীর ভাই (৩) বেয়াই (৪) খলিফা (৫) সর্বোপরি তাঁর জানাযার ইমাম।

হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীর এই উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক মহিমার সাংকেতিক কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় স্বয়ং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র কালামে। যেমন:

(ক) অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর বর্ণনায়: আমার পিতা হযরতের একমাত্র পুত্র, শাহ্ ছুফী সৈয়দ মৌং ফয়জুল হক সাহেবের ওফাত হওয়ার কয়েকদিন পর একদা [হযরত কেবলা] খাদেমকে একখানা শাল কাপড় ও নিজের পাগড়ী মোবারক দিয়া বলিলেন, “এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর পড়াইয়া দাও এবং এই পাগড়ীটি তাহার ছিরানে রাখিয়া দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তাহার আরজু ছিল। আমি তাহাকে জনাব মৌলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ.)-এর চেহারার উপর রাখিয়াছি।”

(খ) পবিত্র কোরআনের দশটি পাতা সামনের পুকুরে এবং সতেরটি পাতা তাঁর একমাত্র পুত্র মরহুম সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবের কবরের উপর রাখার নির্দেশ।

(গ) [খায়েজ আহমদ] আমার মিঞা ফয়জুল হকের মোসাহেব।

(ঘ) খায়েজ আহমদের কলিকাতা আমার আন্দরবাড়ী। আর [আমার] মিঞার [সৈয়দ ফয়জুল হক] কলিকাতা চট্টগ্রাম শহর।

[সাংকেতিক এই সমস্ত ব্যাখ্যার বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী রচিত বেলায়তে মোত্লাকা, ৯-স, পৃ. ৬৬, 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' পঞ্চদশ প্রকাশ, পৃ. ১৯৬, ১৩৭।]

এই প্রসঙ্গে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আগত জৈনপুরীর পীর সাহেবকে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উপস্থিতিতে ওয়াজ মাহফিলে মর্যাদাপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্টকরণে মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী প্রত্যুতপন্নমতিত্বপূর্ণ হেকমতি প্রস্তাবের বিষয়টি স্মরণযোগ্য – জীবনী ও কেরামত, পৃ. ১৫, স. ২০০০, পৃ. ৭৩।

উল্লেখ্য, স্বয়ং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যপূর্ণ সাংকেতিক কালামসমূহের প্রতিফলিত রূপ পরিলক্ষিত হয় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর স্বনামধন্য খলিফা মকবুলে কাঞ্চনপুরী বাহারুল উলুম মাওলানা সৈয়দ আবদুল গনি কাঞ্চনপুরী মাইজভাণ্ডারী'র ঐতিহাসিক 'আয়নায়ে বারী' গ্রন্থেও। এই গ্রন্থে হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী'র আধ্যাত্মিক মহিমা বর্ণনায় তিনি একটি লক্বব ব্যবহার করেছেন। তা হলো, 'বেলায়তে মা'য়াব'। যার অর্থ তিনি (সৈয়দ ফয়জুল হক) হলেন: স্বয়ং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তি ক্ষমতার ধারক।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রথম মোন্তাজেম

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের অতি মর্যাদাবান সুউচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থানের কারণে পারিবারিক, সামাজিক, সামাজিকতা যুগপৎভাবে পালন করা সম্ভব ছিল না। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী, ভক্ত-অনুসারী-অনুরাগী, খলিফা তাঁর সমীপে উপস্থিত হতেন। তাঁদের থাকা-খাওয়া এবং খেদমতের আনজাম দেয়ার মূখ্য দায়িত্ব ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর উপর। খলিফা, ভক্ত, অনুসারীদের আনীত যাবতীয় তোহফা গ্রহণ, বণ্টন এবং সংরক্ষণও তিনি করতেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় অন্য কেউ তা করতেন না। এক কথায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রথম ও প্রধান মোন্তাজেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চট্টগ্রাম জিলার নানুপুর নিবাসী মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল আলী সাহেব গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের সমসাময়িক অতি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। একদা তিনি হালুয়া তৈরীর উদ্দেশ্যে মেওয়া (ফল) সংগ্রহ করতে না পেরে প্রয়োজনীয় ফলের আশায় তৎপুত্র মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে হযরত কেবলা সমীপে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ প্রেরণ করেন। মৌলভী আবদুল আলী সাহেব

স্বীয় পুত্রকে একটি টাকা ও রুমাল প্রদান করে বলেন যে, "তুমি এই টাকাটি তাঁর ছেলে সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবের হাতে দিয়ে বলবে, আমার কতেক ফলের একান্ত দরকার, কোথাও পাচ্ছিনা, তাই আমি কিছু ফল চাচ্ছি। যে কয়টি পাওয়া যায় নিয়ে আসবে। সবগুলি হয়তো পাবেনা। কারণ আমার অনেক ফলের দরকার।" উল্লেখ্য যে মাওলানা আবদুল আলী সাহেব কত পরিমান এবং কি কি ফলের দরকার তা স্বীয় পুত্রকে বলেন নি। পিতার আদেশ মতো মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব হযরত কেবলা আলমের হুজরার সম্মুখে এসে সমস্ত কথা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে অবহিত করেন। মৌলভী সাহেব টাকা ও রুমাল দিতে চাইলে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাহেব শুধু রুমাল গ্রহণ করেন, টাকা নেননি। এ দিকে অন্দর হুজরায় উপবিষ্ট হযরত কেবলা আলম স্বীয় পুত্রকে ডেকে বললেন, "মুহাদ্দিস সাহেবের ছেলেকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন।" মুহাদ্দিস সাহেবের ছেলে অন্দর হুজরায় গমন করে টাকা ও রুমাল হযরত কেবলা আলমের পবিত্র হস্তে প্রদান করলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী রুমাল গ্রহণ করেন, কিন্তু টাকা ফেরৎ দেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সমীপে মওলানা আবদুল আলী সাহেব 'নোছখা' (ফর্দ) প্রদান না করলেও হযরত কেবলা নোছখা (ফর্দ) অনুযায়ী সমুদয় ফল রুমালে বেঁধে দেন এবং তা পথে খুলতে নিষেধ করেন। এ ঘটনায় দেখা যায় যে, হযরত কেবলা আলম সমীপে যে কোন আবেদন এবং ফরিয়াদ পেশের মাধ্যম ছিলেন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এ ঘটনায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পুত্রের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা যায়। (সূত্রঃ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী ও কারামত, পৃষ্ঠা-৬৭)

গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম জামাতে উলার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বিষয়ে হযরত কেবলার কাছে অনুমতি নিতে গেলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্বীয় পুত্র হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীকে তাঁর দোয়ার মেহরাব নামীয় হুজরা শরিফের তাক থেকে হরিরী জুব্বা'টি নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে হযরত কেবলা আলমের কোন নির্দেশ স্বীয় পুত্র সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত কার্যকর হতো না। এটি মূলত হযরত আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (র.) বর্ণিত 'বেলায়তে মা'য়াব' এর দায়িত্ব অর্পনের বিষয়কে স্পষ্ট করেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, তিনি দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি মাইজভাণ্ডার শরিফের প্রথম মোন্তাজেম ছিলেন।

---

১. মির হোছন: হযরত ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীর প্রথম পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ দেলাওর হোসাইন। উল্লেখ্য, (ক) সাধারণ্যে সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীর দুই সন্তানের মধ্যে প্রথম জনের নাম মীর হাসান, দ্বিতীয় জন মীর হোসেন তথা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী। কিন্তু এই কবিতায় দেখা যায় প্রথম জনের নাম মীর হোছন। (খ) এ কবিতায় দেখা যায় সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীর আটজন পুত্র কন্যা। যার মধ্যে একমাত্র সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীই বর্তমান।

২. আলেম – ওলী, আমেল-আমল কারী তথা বাস্তবায়নকারী।

৩. ফাজেল – ফজিলতওয়ালা, মর্যাদাসম্পন্ন।

৪. কামেল – পূর্ণতা প্রাপ্ত, পূর্ণ কামালিয়াত প্রাপ্ত।

৫. তোয়াজ্জু – সরাসরি আধ্যাত্মিক ফয়েজ প্রাপ্ত।

৬. মারফত – আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি।

গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ: হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) [১৮৬৫–১৯৩৭]

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রধান খলিফা সৈয়দ গোলাম রহমান 'হযরত বাবা ভাণ্ডারী' এই নামে সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত।

বাবা: সৈয়দ আবদুল করিম। মাতা: সৈয়দা মোশাররফ জান।

জন্ম: ২৭ আশ্বিন, মতভেদে ১৩ ভাদ্র ১২৭০ বাংলা সোমবার (১৮৬৫ খ্রিঃ)।

শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি পারিবারিক ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসায়। অতঃপর শহর চট্টগ্রামের মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ির জামেয়ুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসা হয়ে চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্‌রাসা। জামায়াতে উলার ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালীন আধ্যাত্মিক ভাব বিভোরতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ার পরিসমাপ্তি।

বিবাহ: তেইশ বছর বয়সে জামাতে দোয়ামের ছাত্রাবস্থায় ফটিকছড়ির সুয়াবিল নিবাসী সৈয়দ কমর চাঁদ শাহ (র.) এর বংশধর আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ আলী (রহ.)-এর প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ জেবুন্নেসা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

সায়ের (সফর): হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে অতি আদরের সাথে প্রীতির নজরে দেখতেন সর্বদা। বাবাভাণ্ডারীও তাঁর প্রতি ছিলেন পতঙ্গতুল্য আশেক। কিন্তু উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক নির্দেশনার কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানোর জন্য হযরত সাহেবানীর পরামর্শে বাবা ভাণ্ডারী সায়েরে (আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ) বেরিয়ে যান। অতঃপর নদী-সাগর, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সায়ের (সফর) করে ৪০ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে আসেন।

আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য: হযরত বাবা ভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কিংবদন্তিতুল্য বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর হস্তনিঃসৃত পানি। হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তাঁর পবিত্র ডান হাত মোবারকের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা একাধারে পানি ঢালা হতো। দূরারোগ্য ব্যাধির উপশম এবং মনষ্কামনা পূরণের নিয়তে আশেক ভক্তরা এ নাতিশীতোষ্ণ পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতেন। তাঁর পবিত্র স্মৃতি হিসেবে এটি দৃশ্যমান করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাঁর রওজা শরিফের পাশে স্মৃতিকক্ষে।

সফর থেকে বাড়ি ফেরার কিছুদিন পর তিনি নিজ জবানে কথাবার্তা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। প্রায় তেইশ বছর যাবত পবিত্র জবান বন্ধ রেখেছিলেন। ক্বচিৎ যা বলতেন তাও খুব সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। হযরত বাবাভাণ্ডারীর জীবন প্রণালী ও কার্যাবলী সবই ছিল আধ্যাত্মিকতার মোড়কে রহস্যাবৃত। তিনি যেন সুফি কবির অমর কবিতা যেখানে 'সরাব' প্রকৃত জাগতিক সরাব নহে; সাকী নহে কোন রূপসী তন্বী। সবই রূপক ও ব্যঞ্জনাময়।

ওফাত: সুদীর্ঘ একাত্তর বছর ছয় মাস কাল ইহজগতে আধ্যাত্মিক লীলা সমাপন করে ১৯৩৭ সালের ৫ এপ্রিল (২২ চৈত্র ১৩৪৩) সোমবার ভোর ৭.৫৫ মি. ওফাতপ্রাপ্ত হন।

তাঁর ওফাতের দ্বিতীয় বর্ষে তদানিন্তন বৃটিশ সরকারের উজির নবাব কাজী মোশাররফ হোসেনের হাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র রওজা মোবারকের কাজ শুরু হয়।

তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জনসম্পৃক্ততাকে মর্যাদাপূর্ণভাবে আমলে নিয়ে ১৯৩৯ সালে তাঁর ২য় বার্ষিক উরস উপলক্ষে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কনসেশন টিকেটে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিল। এ উপলক্ষে রেলওয়ের পক্ষ থেকে (৯২' ৬২') মাপের ৪ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা ফুটে উঠেছে প্রায় দৃশ্য কাব্যের মতো।

'তিনি একাধিক্রমে ১২ বৎসর পাহাড়ে জঙ্গলে, নগরে প্রান্তরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতঃ ৪০ বছর বয়সে স্বীয় পীর গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ শাহ্ (ক.) সাহেবের খলিফা রূপে স্বতন্ত্র হুজরায় গদীনশীন হন। তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, এমনকি সুদূর আফগানিস্তান, পারস্য ও আরব হইতে অসংখ্য লোক অহরহ তাঁহার সমীপে হাজির হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করত নিজ নিজ মনষ্কামনা লাভ করিতে থাকে।' চট্টগ্রাম– আর-এস, ভাইপ্যান, চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯।[১]

কারামত

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর পুরা জীবনটাই ছিল আধ্যাত্মিকতার মোড়কে রহস্যাবৃত। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কারামত প্রকাশ পেত বিভিন্নভাবে। লিখিত-অলিখিত, শ্রুত, অশ্রুত হাজারো কারামত থেকে মাত্র ৫৪টি কারামত গ্রথিত হয়েছে তাঁর জীবনীগ্রন্থে।

হস্তনিঃসৃত পানিতে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার

হযরত বাবাভাণ্ডারীর অজস্র কারামতের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর হস্তনিঃসৃত পানি। তাঁর কারামত সম্পর্কিত আলোচনায় হস্তনিঃসৃত পানির বিষয়টিই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে এই হস্তনিঃসৃত পানি রীতিমত মহৌষধের মতো কাজ করত।

এক নজরে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর বিশেষত্ব

১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সোহবত ও আধ্যাত্মিক মহিমায় ধন্য হয়ে তাঁর জীবদ্দশায় মর্যাদাপূর্ণভাবে স্বীয় আধ্যাত্মিক উরুজের আত্মপ্রকাশ।

২. তদীয় খোলাফায়ে কেরামের মাধ্যমে ত্বরিকার ব্যাপ্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন।

৩. জাগতিক নীরবতা, ইশারা-ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশের নতুন সংস্কৃতির সংযোজন।

৪. হস্তনিঃসৃত পানির আধ্যাত্মিক মহিমা প্রকাশের মুখপাত্র। যা কালক্রমে কিংবদন্তিতে পরিগণিত। শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনেও যার প্রভাব ছিল ক্রিয়াশীল।

৫. তাঁর সাড়া জাগানো আধ্যাত্মিক মহিমাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবদ্দশায় **১৯৩১** সালে তাঁর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ।

৬. তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা ও ব্যাপক জনসম্পৃক্ততার বিষয়কে মর্যাদাপূর্ণভাবে আমলে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় ওফাত বার্ষিকীতে ২২ চৈত্রের বার্ষিক উরস উপলক্ষে কনসেশন টিকেটে তিনদিনের জন্য আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা।

৭. তাঁর ফয়েজ রহমতে অভিষিক্ত হয়ে কবিয়াল রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারী গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীতে পরিগণিত এবং তিনশতাধিক মাইজভাণ্ডারী গান লিখে সাধারণ্যে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেন।

---

১. মূলকপি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের রহমান মন্‌জিলের সৈয়দ জাহাঙ্গীর ফজলের কাছে সংরক্ষিত। উদ্ধৃত: মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ: ৪০৭।

বাবাভাণ্ডারীর বংশলতিকা – চার পুত্রঃ সৈয়দ খায়রুল বশর, সৈয়দ আবুল বশর, সৈয়দ মাহবুবুল বশর, সৈয়দ শফিউল বশর, দুই কন্যা: সৈয়দা মায়মুনা খাতুন, সৈয়দা সাজেদা খাতুন।

কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ক.)

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬–১৯০৬) স্বনামধন্য '৪ (চার) আমিনের' অন্যতম হলেন মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। অন্য তিনজন আমিন হলেন (১) মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (২) মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরী এবং (৩) সৈয়দ আমিনুল হক পানি শাহ্।

গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলিফা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। 'ওয়াসেল' তাঁর মাইজভাণ্ডারী পদবি। 'ওয়াসেল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব তথা পরস্পর মিলন হওয়া। যিনি-ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বিধায় তিনি এ লকব ধারণ করে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে এই নামেই সমধিক পরিচিত ও প্রচারিত হন। আধ্যাত্মিক অর্থে তাঁর লকব হলো "ফানায়ে ওয়াসেল"–আসলের সাথে ফানা বা একাকার হয়ে যাওয়া।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচারকার্য চালানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতেন। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল এর উপর। ব্যক্তিগতভাবে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং তাঁর প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে জনসমক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর বক্তব্য স্মরণযোগ্য–

'আমি নিজেও হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী সাহেবের নিকট বায়াতে সুন্নাত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে বায়াত হন'।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর হাবভাব, কথাবার্তা এবং ইশারা ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা দিতেন বলে তিনি 'কুত্‌বে ইরশাদ' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তিনি 'ছোট মাওলানা সাহেব' নামেও পরিচিত।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মেজভাই সৈয়দ আবদুল হামিদ এর দুই পুত্রের কনিষ্ঠজন সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের জন্ম, শিক্ষা, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। শুধু জন্ম তারিখ নয়; জন্মসাল প্রশ্নেও তাঁর স্বজনদের মধ্যে নানা প্রশ্ন আছে। তবে এ তথ্য প্রচলিত আছে যে, তিনি বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের সমসাময়িক এবং বয়সে অনুজ ছিলেন। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কেও একই অবস্থা। তবে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর 'এলাকার রেনেঁসা যুগের একটি দিক' গ্রন্থ সূত্র থেকে জানা যায়, তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে টাইটেল পাস করেছিলেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে তদীয় বিশিষ্ট খলিফা হযরত কাজি আছদ আলী শাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র.) তাঁর কন্যাকে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারীর সাথে বিয়ে দেন। স্বীয় মনিবের (পীরের) ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল আনুষ্ঠানিক বিয়েতে সম্মত হলেও সংসার-ধর্ম পালন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা ছিল এরূপঃ আমি আমার শরীর-মন-প্রাণ সবকিছু সর্বান্তকরণে আমার মনিব গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর চরণতলে সোপর্দ করে দিয়েছি। সুতরাং এমতাবস্থায় সংসারধর্ম পালন আমার পক্ষে কী করে সম্ভব?

আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য

সচেতনভাবে জাগতিক সকল বিষয় থেকে নিজেকে নিবৃত রেখে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার-প্রসারে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে নিজের মনন, মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী। জাগতিকতার আবরণ ও আভরণে চরম আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত প্রেম খেলার 'বৃন্দাবন সম' এক প্রেম বাগান মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাথে আমিনুল হক ওয়াসেল এর গভীরতম সম্পর্কের বিষয়টি পূর্বোক্ত ৪ আমিনের অন্যতম, মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী তাঁর গানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

প্রেম মদে মত্ত হয়ে হরিলাম গো প্রেম বাগানে।
প্রেম নিধি শুইয়াছে-প্রেম ফুলের সিংহাসনে ॥
দীনমণির রূপ নিতে-তারকা মণ্ডল সাথে
নানা ছলে কৌতুহলে-শশী খেলে বন্ধুর সনে ॥

ভাণ্ডার সে বৃন্দাবন, প্রেম নিধি গাউছধন।
আমীন ধন শশী হেন-কহে দাস হাদী হীনে ॥
[রত্ন সাগর, সুফি মৌঃ আবদুল হাদী বিরচিত ৩০নং গান।]
হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে মওলানা হাদী আরো লিখেন–
মাওলানা আমিন ধন উপায় কী হইবে বল।
গাউস ধনের প্রেম তাড়নায় জীবন ত্যাজিতে হৈল ॥
দেখাইয়ে চরণ ঠার হরি নিল মন আমার।
মন আশে কেঁদে কেঁদে এ নব যৌবন গেল ॥
কাল হৈল এই সার, প্রেমের অনলতায়
কাকনুছ পক্ষীর মত, দহিয়া জ্বলিতে হল ॥
দীন হাদী প্রেমানলে কান্তভাবে না দহিলে।
দুই কুলের মাঝে জান, তোমার কলঙ্ক হইল ॥
[রত্ন সাগর, পূর্বোক্ত ৯৪নং গান।]

'মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ শশী' তথা গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর ভক্ত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে গেলেন। তাঁর আক্ষেপ নিজের শরীর এবং মন পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করার পরও 'গাউসে পাক' কেন তাকে বিরহের আগুনে পোড়াচ্ছেন? তাই 'আমিন ধনের চরণে তথা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের কাছে গীতিকার হাদীর স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে–
হইয়াছি বন্ধুর ভাবে মনতাপে বনবাসী,
স্বপ্ন দিয়া গেলে কোথায় মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ শশী।
বাঁধি মোরে প্রেম ডোরে কী দোষে বঞ্চিলা পরে,
মনদুঃখ বনে বনে কেঁদে ফিরি দিবানিশি।
মন-তন সপিলাম যারে সে কেন ভুলিল মোরে,
বিরহ অনলে জ্বলি করে সদা কেলি হাসি।
আমিন ধনের চরণ তলে হীন দাস হাদী বলে,
মন তন সপি কেনে হইলাম তবে প্রেম দোষী।
[রত্ন সাগর, পঞ্চম সংস্করণ, পূর্বোক্ত, ১৬নং গান।]

ত্বরিকার প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাধন পদ্ধতিতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সামা এবং এতদসঙ্গে হালকা জজ্‌বা। এই সামা ও হালকা জজ্‌বা প্রচলনের ক্ষেত্রে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল এর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা সর্বজনশ্রুত ও সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে অছি-এ-গাউসুল আযম এর বক্তব্য উদ্ধৃতযোগ্যঃ

হযরত গাউসুল আযম এর এক বুজুর্গ ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক সাহেব (র.) জমায়াতের সাথে বাদ্যসহকারে হালকা জজ্‌বার মজলিশ করিতেন। আঁ হযরত কেবলা কাবার দায়রা শরিফের সোজা দক্ষিণ দিকে মধ্যখানে একটি ‘দর’ বা বাহির উঠানে আসার পথ বাদ, সৈয়দ মৌং আবদুল করিম সাহেবের যেই কাছারী ঘর ছিল, তাতে ছোট মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক কুত্‌বে ইরশাদ ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী সাহেব মুরিদান ও পীর ভাইগণসহ নিজে হালকা জজ্‌বা করতেন ও করাতেন। আমরাও সেই ঘরে হাজির হইতাম ও তাঁহার তালিম নিতাম। এই কাছারী ঘরখানাকে হযরত কেবলা দপ্তরখানা বলতেন। হযরত আকদাস লোক বিশেষকে কোনো কোনো সময় বলতেন, ‘দপ্তরখানায়’ আমার ‘আমিন মিঞার’ কাছে গিয়ে বস। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলায়ে আলমের অন্যতম খলিফা ছিলেন চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানা নিবাসী নাসির মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ীর হযরত শাহ্‌ সুফি আবদুল বারিক চৌধুরী। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরে সামা মাহ্‌ফিলের প্রথম আয়োজন হয় আবদুল বারিক চৌধুরীর গৃহে। এ মাহ্‌ফিলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। উল্লেখ্য এ মাহ্‌ফিলে সে রাতে হযরত কেবলা আলমের বিখ্যাত খলিফাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই মাহ্‌ফিলে হাল জজ্‌বা এরূপ হয়ে পড়েছিল যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে যেখানে ছিলেন সেখানেই অজদের সৃষ্টি হয়। এ দৃশ্য দেখে এ বাড়ীতে যারা ‘সামা’র বিরুদ্ধে সরব ছিলেন তারাও হতবাক হয়ে যান।

সাধারণতঃ যে সকল এলাকায় সামার বিরুদ্ধে ফতোয়া আসত অথবা যারা সামা প্রতিরোধে সরব হতো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলায়ে আলম সেসব এলাকায় হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করে সামার হাকিকত উন্মোচন করতেন। সামা চলাকালে অংশগ্রহণকারীদের বেখুদি অবস্থা এবং মহান আল্লাহ্‌ প্রেমে আত্মার আর্তচিৎকার দেখে বিরোধী পক্ষ প্রায়ই সংযত হয়ে যেতেন।

যাচাই-বাছাই এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা বিভিন্ন গানেও স্থান করে নিয়েছে অবলীলাক্রমে–

হক ভাণ্ডারী আমিনুল হক

আদি অন্তে হকের হক।
যাচাই করে বাছাই করেন
আসল নকল ঠক-বেঠক ॥
ঠক নকলের নাম উঠেনা,
তাঁহার বালাম খাতাতে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬–১৯০৬) ওফাতের মাত্র ৪৩ দিন পূর্বে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন। (সূত্র : এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক)

সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী কেবলার ওফাত সম্পর্কে হযরত শাহ্ সুফি আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর অভিমত হচ্ছে হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের ওফাতের সংবাদ শ্রবণ করে তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফ গমনের উদ্দেশ্যে রোসাংগিরি অতিক্রমকালে পথিমধ্যে বাবা ভাণ্ডারী কেবলায়ে আলমের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। এ সময় বাবা ভাণ্ডারী কেবলায়ে আলম তাঁকে সঙ্গে করে একটি পুকুরে নেমে পড়েন এবং সাতবার এপাড় ওপাড় সাঁতার কাটেন। এ ঘটনার পর আল্লামা ফরহাদাবাদী (র.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ পৌঁছেন। জানাযায় উপস্থিত হলে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলার নির্দেশ মতে আল্লামা ফরহাদাবাদী ইমামতি করেন। কিন্তু তিন তকবীর প্রদানের পর আল্লামা ফরহাদাবাদী আকস্মিক বেহুঁশ হয়ে পড়লে বাকী শেষ তকবীর হযরত কেবলায়ে আলম স্বয়ং প্রদান করে জানাযা সমাপ্ত করেন। এ ঘটনাটি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের আধ্যাত্মিক অবস্থানের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ছোট মাওলানা সাহেব কেবলার ওফাত বিষয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও ২৫ অগ্রহায়ণ তাঁর ওফাত দিবসটি মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। প্রতি বছর ২৫ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ‘গাউসিয়া আমিন মঞ্জিলের’ উদ্যোগে তাঁর বার্ষিক উরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি কোনো সংসার ধর্ম পালন করেননি বলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীয় আওলাদগণই তাঁর বার্ষিক উরস ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের সাথে পূর্ব কক্ষে তাঁর মাজার শরিফ বর্তমান।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত ১৯০৭ সালে প্রকাশিত ‘ওফাতনামা’ নামে পয়ারছন্দে লেখা পুস্তিকায় তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা, তাতে দেখা যায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। ‘ওফাতনামা’ পুস্তিকার ১২–১৪ পৃষ্ঠায় আমিনুল হক ওয়াসেলের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক মহিমা, বিশেষত গাউসে পাকের সাথে তাঁর সুগভীর বহুমাত্রিক সম্পর্কের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

গাউসে ধনের চল্লিশ দিবস পূর্ব আগে
ভ্রাতৃপুত আমিনুল হক চলি গেল স্বর্গে।
সানি গাউসে ধনের রূপ ছোট মাওলানার।
অকালে চলিয়া গেল স্বর্গের মাঝার।
...
কোথায় গেলে পাব আমি হেন রূপ বন্ত
যে করাইতে পারে দিদার সেই প্রাণের কান্ত
সবে বলে মাওলানা আমি বলি সাম (শ্যাম)
হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ মাওলানার নাম।
(ওফাতনামা, আমিনুল হক হারবাংগিরী)

'সানি গাউসে ধন' ও 'যে করাইতে পারে দিদার সেই প্রাণের কান্ত' এই দুটো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনায় গাউসে পাকের সাথে তাঁর সম্পর্কের মাত্রা এবং 'সবে বলে মাওলানা আমি বলি সাম, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ মাওলানার নাম' এই দুটো চরণে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তাঁর অবিসংবাদিত গ্রহণযোগ্যতা, সর্বোপরি তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা সহজেই অনুমেয়।

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৯৩–১৯৮২]

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮২৬–১৯০৬) এবং তদীয় খলিফায়ে আযম হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮৬৫–১৯৩৭) এই দুই মহান আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের যুগপৎ রক্ত ও বেলায়তের যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের উল্লিখিত দুই মহান দিকপালের আধ্যাত্মিক ফয়েজ রহমতে অভিষিক্ত হয়ে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ব্যতিক্রমধর্মী নতুন সত্ত্বা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মাইজভাণ্ডার পরিমণ্ডলে। ভক্ত ফকির ফরিদ হোসেনের ভাষায়–

ফুটলরে ফুল গাউসে অলি, গোলাম রহমান বাবাজান বলি,/ভাষা ভুলা হাল-অলী থাকতেন বিভোর অবস্থায়।

দুই দিক হইতে ফয়েজপ্রাপ্ত, "দেলাওর হোসাইন" খোদাভক্ত,/মাইজভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত কইরাছেন গাউস খোদায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র পৌত্র এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারী'র জামাতা।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

জন্ম: ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ [ফাল্গুন ১৩, ১২৯৯]

পিতা: শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৬৫–১৯০২]

পিতামহ: মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮২৬–১৯০৬)।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান সৈয়দ মীর হাসানের (১৮৯১–১৯০৬) নামের সাথে মিল রেখে তদীয় পিতামহ [হযরত কেবলা] তাঁর নাম রাখেন সৈয়দ দেলাওর হোসাইন। হযরত কেবলা প্রদত্ত এই নাম ছিল ব্যঞ্জনাপূর্ণ। দেলাওর অর্থ যোদ্ধা বা সেনাপতি; হোসাইন অর্থ উত্তম। সুতরাং পুরা অর্থ দাঁড়ায় "উত্তম সেনাপতি" বা "বীরোত্তম"। পরবর্তীকালে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার

শরাফত সংরক্ষণ এবং ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচনকালে তাঁর এই নামের মাহাত্ম্য ও যথার্থতা পরিস্ফুট ও প্রতীয়মান হয়। শিশু দেলাওর শৈশবে তাঁর পিতাকে হারান (১৯০২)। ফলে দাদা-দাদীর স্নেহে পালিত হন। ইতোমধ্যে ১৩ বছর বয়সে দাদাও (হযরত কেবলা) চির বিদায় নেন। পাঁচ বৎসর বয়সে দাদা হযরত কেবলার হাতেই শিশু দেলাওর হোসাইনের হাতে খড়ি। এ সময় পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাবুনগর নিবাসী মাওলানা অলিউল্লাহ্ সাহেব তাঁর প্রথম শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে মির্জাপুর নিবাসী তাঁর খালু মওলানা হাফেজ ক্বারী তফাজ্জল হোসাইন সাহেব তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই মহান খলিফার হাতেই তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার প্রয়োজনীয় মূল্যবান কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। এই গৃহশিক্ষকের প্রভাব সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। উল্লেখ্য, তদীয় এই গৃহশিক্ষকের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি দরবার শরিফের লাইব্রেরীর নামকরণ করেছিলেন তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ইতোমধ্যে তিনি ১৯১১ সনে চট্টগ্রাম মোহসেনীয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন শেষ করেন।

ছাত্রজীবনে পাঠ্যবই ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত বাংলা পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন। আশ্চর্যের বিষয়, প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহ শিক্ষকের নিকট শুধুমাত্র ১৭ দিন তিনি বাংলা শিখেছিলেন। তারপর আর কোন শিক্ষকের কাছে বা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করেননি; অথচ মাইজভাণ্ডার সম্পর্কিত যে ১২টি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন তার সবই বাংলা ভাষায় রচিত।

অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, তিনি ছিলেন ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র (ক.) অছি [Vicegerent]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক প্রকাশ্যে গাউসিয়তের ঘোষণার অনুরূপ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও প্রকাশ্যে তাঁর অছি'র দাবী ঘোষণা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রকাশ্য ঘোষণার এই সর্বসম্মত প্রথা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণীয়। অছিয়ে গাউসুল আযম হওয়ার এই দুর্লভ প্রাপ্তির সুন্দর বর্ণনা মেলে আশেক ভক্তের ভক্তি শ্রদ্ধা মিশ্রিত গানের মাধ্যমে–

হোসেন কেবলা মাইজভাণ্ডারী প্রেম সাগরের মূল কানাই/গাউসে ধনের অছি যিনি তার তুলনা পাই কোথায়? –ময়না জগত (১), ৩২ নং গান।

বিবাহ ও বংশলতিকা: ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর (প্রকাশঃ বাবা ভাণ্ডারী) দ্বিতীয় কন্যা সৈয়দা সাজেদা খাতুনের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন ৫ (পাঁচ) পুত্র ও ৬ (ছয়) কন্যার জনক।

পুত্র সন্তান: (১) সৈয়দ জিয়াউল হক (২) সৈয়দ মুনিরুল হক (৩) সৈয়দ এমদাদুল হক (৪) সৈয়দ দিদারুল হক (৫) সৈয়দ সহিদুল হক। কন্যা সন্তানঃ (১) সৈয়দা মোবাশ্বেরা বেগম (২) সৈয়দা মুনিরা বেগম (৩) সৈয়দা নাজিরা বেগম (৪) সৈয়দা রিজিয়া বেগম (৫) সৈয়দা কামরুন্নেসা (৬) সৈয়দা নাজমুন নেসা।

গ্রন্থ তালিকা: সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে লেখালেখি ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১২:

১. বেলায়তে মোত্লাকা (১৯৬০), ২. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত (১৯৬৭), ৩. গঠনতন্ত্র (১৯৬৯), ৪. মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার [১ম খন্ড] (১৯৬৯), ৫. বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ (১৯৭৪), ৬. এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক, ৭. জীবনদর্শন (আত্মজৈবনিক) পাণ্ডুলিপি, ৮. প্রতিবাদ লিপি, ৯. মানব সভ্যতা, ১০. মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া, ১১. মুসলিম আচার ধর্ম, ১২. মূলতত্ত্ব [২য় খন্ড]

খাদেমুল ফোক্বারা: ব্যক্তিগত জীবনে দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ছিলেন রীতিমতো বিনয়ের অবতার। বিনয়ের মধ্যেও যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন। নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় তিনি অতি বিনয়ের সাথে বলতেন যে, তিনি হলেন 'খাদেমুল ফোক্বারা' অর্থাৎ আল্লাহ্র ফকিরদের খাদেম এবং সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে ফকিরদের খাদেমগীরিতেই তিনি সারাজীবন উৎসর্গ করেন। বিনয়ের এমন অবতার সত্যিই বিরল– 'দেলাওর হোসাইন নাম জাহেরা পরিচয় দেন খাদেমুল ফোক্বারা। বিনয়ের এহেন অবতার, ত্রি জগতে মেলা ভার' – ড. সেলিম।

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন নির্বিলাসী। কনুইর নিচ পর্যন্ত লম্বিত সাদা কামিজ বা কোর্তা, মাথায় সাদা টুপি, পায়ে কাঠের খড়ম এবং শীত গ্রীষ্মের উপযোগী চাদর-এ ছিল তাঁর নির্বিলাসী পোশাক পরিচ্ছদ।

শুধু জীবৎকালে নয়; ওফাতের পরও তিনি তাঁর এই বিনয়ী ও নির্বিলাস জীবনের প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন। ওফাতের পর তাঁর জন্যে কোনরূপ 'মাজার নির্মাণ' থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। প্রকৃতির ঔদার্য ও মহিমা নিয়ে প্রকৃতির কোলে চিরশায়িত থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তাঁর নিজের এপিটাফ নিজেই

রচনা করে যান। আমার বিবেচনায় এই এপিটাফটিই তাঁর 'খাদেমুল ফোক্বারা' অভিধার প্রবহমান প্রতিচ্ছবি।

ওফাতঃ সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকালেরও উর্ধে প্রত্যক্ষ কর্মময় জীবনে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে সব্যসাচীর মত দুই হাতে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে তথ্য, তত্ত্ব ও বিচিত্র বর্ণাঢ্য কর্মচাঞ্চল্যের অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার শরাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন শেষে প্রায় ৯০ বছর বয়সে **১৯৮২** সালের **১৬** জানুয়ারি শনিবার (২ মাঘ **১৩৮৮**) তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী দুর্বাঘাস শোভিত শ্যামল প্রকৃতির বুকে তাঁকে সমাহিত করে তাঁর স্বহস্তে লিখিত এপিটাফটির মাধ্যমে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হয় এভাবে–

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরাপাত্র / সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুলক্ষেত্র।

কোলাহল পরিহারে নির্জনতার আসরে / তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি আজি তোমারই বাসরে।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বাণী চিরন্তনীঃ

১. "বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং ধান উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার বিকল্প নেই।"

২. "আগে নিজের পরিবার, ঘর-সংসার ও পেশাগত দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হও। তারপর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সময় দাও যদি তা সম্ভবপর হয়।"

৩. "পরিচ্ছন্নতা খোদায়ী গুণ। তুমি যদি কাজে-কর্মে, দেহ-প্রাণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, মন-মানসিকতায়, আচার-ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন না হও, তা'হলে তুমি খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবেনা।"

৪. "সৎভাবে হালাল ব্যবসা কর। দুর্নীতির আশ্রয় নিওনা। তেজারত রসূলের সুন্নত।"

৫. "অহমিকা বড় খারাপ। অহমিকা ও দম্ভ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কর।"

৬. "জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান ছাড়া কোন জাতি জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেনা।"

৭. "তুমি যদি যোগ্য না হয়ে বুজুর্গী কামনা কর, তা তুমি পাবেনা। হযরত সাহেব (ক.)'র সাথে কেবলমাত্র রক্তের সম্পর্কের কারণে তুমি নিজেকে অলি দাবী করতে পারনা। অলি হতে হলে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।"

৮. "যাঁদের কামালিয়ত নেই তাঁরা মাইজভাণ্ডার শরিফের আওলাদ হলেও তাঁদের কবরের ওপর সৌধ বা রওজা নির্মাণ করা উচিৎ নয়। এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করবে যেহেতু মানুষ প্রকৃত অলিকে তখন চিহ্নিত করতে পারবেনা।"

৯. "মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের যে কোন আওলাদে পাকের উরস অনুষ্ঠান করা ঠিক নয়। উরস অনুষ্ঠান কেবলমাত্র ওই সকল আওলাদের জন্য নির্ধারিত যাঁরা প্রকৃত অর্থে কামালিয়ত অর্জন করে অলি হয়েছেন। সারা বছরই যদি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে কোন না কোন আওলাদের উরস হতে থাকে, তাহলে লোকজনকে তাদের পরিবার এবং চাকুরীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কেবল দরবার শরিফে আসা যাওয়াতেই ব্যস্ত থাকতে হবে।"

১০. "সকলকে আমার মুনিব [হযরত আকদাছ (ক.)] কে সম্মান করতে হবে এবং তাঁর রওজা শরিফ জিয়ারত করতে হবে। যদি তোমরা তা কর, তবে তার অংশ আমি পাব।"

১১. "যদি কেউ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে, তবে সে হযরত আকদাছ (ক.)'র আসহাব বা সাথী হিসেবে গণ্য হবে।"

১২. "যদি মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মর্মকথা সারা বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে সারা বিশ্বের নজর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে ঘুরে যাবে।"

১৩. "সমাজে আদলে মোত্লাক (বিচার সাম্য) প্রতিষ্ঠা কর। কারও প্রতি অবিচার করনা।"

১৪. "ঈমানদার হও। হজ্ব কর, নামায পড়, রোজা রাখ, যাকাত দাও। যেনা করনা, মিথ্যা বলনা, মিথ্যা সকল অন্যায়ের মা-বাপ"।

১৫. "বিপদে আপদে, সকল সময়ে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর কর। আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস হারাবে না। আল্লাহ্ সকল সময়ে তোমাকে সাহায্য করবেন।"

১৬. "আমি ছায়র পীরি ব্যবসা করিনা। পাক-সাফ হওয়ার জন্য মানুষ পুকুরের কাছে যায়। পুকুর মানুষের কাছে যায়না।"

তাঁর শানে গান: মাইজভাণ্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন গানের বইতে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর শানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গান সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, মওলানা আবদুল্লাহ্ বাঞ্ছারামপুরী, ডাঃ মুসা আলম, ফকির ফরিদ হোসেন এবং ডাঃ আবুল কাশেমের নাম। ডাঃ মুসা আলমের গানের বইয়ের নাম ময়না জগত (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)। ফকির ফরিদ হোসেনের বইয়ের সংখ্যা ৮ (আট)। মুক্তি ভাণ্ডার এক, মুক্তি ভাণ্ডার দুই, সৌরভ ভাণ্ডার, গৌরব ভাণ্ডার, যুক্তি ভাণ্ডার, উদয় ভাণ্ডার, হৃদয় ভাণ্ডার, চেতন ভাণ্ডার। ডাঃ আবুল কাশেমের এক মাত্র গানের বইয়ের নাম প্রেমাকর।

এক নজরে অছিয়ে গাউসুল আযমের বিশেষত্ব

১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পৌত্র হিসেবে, পুত্র-বংশীয় একমাত্র আওলাদ হিসেবে যুগপৎ তাঁর ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক সোহবত লাভের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান এবং 'অছিয়ে গাউসুল আযম' লকবে অভিষিক্ত।

২. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিকভাবে **১৯৪৯** সালে 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী' সংগঠন প্রতিষ্ঠা সহ মানবিক সামাজিক ও জনহিতকর কার্যক্রমের উদ্যোগে ও এগুলোর যথাযথ পরিচালনার প্রয়োজনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন।

৩. গাউসে পাকের গদী শরিফের উত্তরাধিকারী হিসেবে যাবতীয় আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালন।

৪. একইসাথে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ধারাকে প্রায় সমানতালে ধারণ, লালন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে দরবারী পরিমণ্ডলে সমন্বয়ধর্মী ইতিহাস সৃষ্টি এবং সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কালেরও অধিক সময়কাল ধরে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে সমানতালে অব্যাহত রাখার নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি।

৫. মাইজভাণ্ডারের অভাবনীয় ব্যাপক প্রচার-প্রসার, অনিয়ন্ত্রিত অলিখিত কর্মকাণ্ড ও নানা ডামাডোলের মধ্যে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও দর্শনকে ওরাল ট্র্যাডিশনের যুগ থেকে শুদ্ধতম উচ্চারণে লিখিতরূপ দেওয়ার পথিক ও পথিকৃতের ভূমিকা পালন।

৬. এ ধারায় বড় ছোট ন্যূনতম **১২**টি গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও বিপণনের ব্যবস্থাকরণ। বলাবাহুল্য, এটি শুধু তাঁর জন্য নয়, সমগ্র মাইজভাণ্ডারের প্রায় দেড়শতাধিক বছরের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এক অনন্য বিশেষত্ব, এক দৃষ্টি আকর্ষণীয় মাইলফলক।

৭. স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আত্মনিবেদনের কঠোর-কঠিন অনুশীলন এবং সমাজ জীবনে এর অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে নিজে 'খাদেমুল ফোক্বারা' (আল্লাহ্‌র ফকিরদের খাদেম) লক্বব গ্রহণ করে কথায়, কাজে ও চিন্তায় এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন জীবনাচরণের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়। এককথায়, তাঁর প্রায় শতবর্ষের পুরা জীবনটাই ছিল এ স্বঘোষিত লক্ববের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সফল বাস্তবায়নের প্রতিচ্ছবি। বলাবহুল্য, ওফাতের পর তাঁকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতামূলক কোন স্থাপনা এবং বাহুল্য বর্জনের অসিয়ত তাঁর 'খাদেমুল ফোক্বারা' লকবের জীবন-মরণ সাধনার সার্থক রূপায়নের যথার্থ প্রতিফলন, কথা ও কাজের অনুসরণীয় অপূর্ব সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৯২৮-১৯৮৮]

পিতার জীবদ্দশায় যিনি স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে স্বতন্ত্র মন্‌জিলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তদীয় পিতার সহানুভূতিপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী।

তিনি ছিলেন গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬–১৯০৬) প্রপৌত্র, হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.) মাইজভাণ্ডারীর (১৮৬৫–১৯৩৭) দৌহিত্র এবং হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) মাইজভাণ্ডারীর (১৮৯৩–১৯৮২) প্রথম পুত্র।

জন্ম: ১০ পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১২ রজব ১৩৪৭ হিজরী, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ মঙ্গলবার প্রত্যুষে।

শিক্ষা: মাইজভাণ্ডার আহ্‌মদিয়া জুনিয়র মাদ্‌রাসা, নানুপুর আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস। অতঃপর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে পাস করে কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে এসে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। যথারীতি সারা বছর লেখাপড়ার পর বি.এ. টেস্ট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ১৯৫৩ সাল– বি.এ. টেস্ট পরীক্ষার তৃতীয় দিন ছাত্র সৈয়দ জিয়াউল হক পরীক্ষার হলে আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন এবং কোন লেখা ছাড়াই সাদা খাতা জমা দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসেন। রহস্যময় এইরূপ আচরণের মধ্যদিয়ে তাঁর জাগতিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই পরিসমাপ্তি।

অতঃপর সৃষ্টির অনন্ত রহস্য সন্ধানে দুর্গম পথের অভিযাত্রী সাধক জিয়াউল হক কানুনগোপাড়া থেকে সোজা মাইজভাণ্ডার শরিফ চলে আসেন। বাড়িতে আসার পর প্রথমে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে দিন কাটাতেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। মাঝে মধ্যে ভাব-বিভোর অবস্থা (হাল জজব) চরমে পৌঁছত। এমতাবস্থায় একদিন তাঁর মা আবদুর রহমান প্রকাশ চুন্নুমিয়া শাহ্ সাহেবকে (সাদেক নগর নিবাসী তিনি

বাগ-এ-হোসাইনী'র খাদেম ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে সমাহিত) ছেলের এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে শাহ্ সাহেব বলেন, "বড়মিয়াকে একটা ঘরে পাক-পবিত্র অবস্থায় রাখবেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেন।" মা এতে স্বীয় পুত্রের আধ্যাত্মিকতার শুভসূচনার ইংগিত পেলেন।

সবকের দীক্ষা: সৈয়দ জিয়াউল হক অনেকবার স্বীয় পিতার নিকট বায়াতের দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। একদা চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড থানাধীন উত্তর ছলিমপুর প্রকাশ ফৌজদারহাটের হযরত মাওলানা সফিরুর রহমান হাশেমী (র.) সাহেব মাইজভাণ্ডার শরিফ জিয়ারতে আসেন। তিনি চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম, ধার্মিক আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা সাহেব তাঁর পিতার সাক্ষাতে উপস্থিত হলে তিনি ছেলেকে বায়াতের 'সবক' পড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। মাওলানা সাহেব বলেন, 'আপনার মত বুজুর্গ থাকতে আমার দ্বারা এ কাজ কি ঠিক হবে?' তিনি উত্তরে বলেন, "আপনি 'সবক'টা পড়িয়ে দেন; বাকি সব আমি করবো"। অতঃপর গাউসে মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র হুজরায় দীক্ষার সবক পাঠ করানো হয়।

রিয়াজত: জৈবিক প্রেরণাজাত সকল প্রকার চাহিদা ও অক্ষমতা নির্মূল করার লক্ষ্যে সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। পৌষের কন্‌কনে শীত। ঠান্ডায় মানুষ লেপ-কাঁথার ভিতরেও টিকতে পারেনা, পৌষ-মাঘের এমনি শীতে অন্দর বাড়ির পুকুরে ঘন্টার পর ঘন্টা, কখনো একটানা দুইদিনও পানিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন। বাড়ির পশ্চিমে লোহার খালেও কখনো কখনো নাক দেখিয়ে ডুবে থেকে সময় কাটিয়েছেন। অত্যধিক ঠান্ডায় শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যেতো, পর পর কয়েকটি শীত-ঋতু তিনি এমনি কষ্টকর-সাধনায় কাটিয়েছেন।

তিনি কখনো কখনো ৩/৪ দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। কখনো একপায়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন। একবার নিজকক্ষে দরজা জানালা বন্ধ করে দীর্ঘ আঠার দিন অনাহারে কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর কখনো একটা পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটাননি। পাহাড়-পর্বত, শহর-নগরের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন অনির্দিষ্ট এবং অনির্ধারিতভাবে।

বৈবাহিক জীবন: ফটিকছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের বিশিষ্ট জমিদার জনাব বদরুজ্জামান চৌধুরী (প্রকাশ 'বদন সিকদার') সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম এর সাথে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

পিতা অছি-এ-গাউসুল আযম থেকে খেলাফত প্রাপ্তি: সময়কাল ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৬, মাঘ মাসের ২ তারিখ। গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ

উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী স্বপ্নে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে বলেন 'জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাঁকে অর্পণ করুন।' তৎপ্রেক্ষিতে ১০ মাঘের উরসের পূর্বদিন সকাল ১১টায় রওজা পাক গোসল শরিফের পর সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী স্বপ্নাদেশ মতে রওজা শরিফের স্মৃতিকক্ষ থেকে হলুদ ও খয়েরী রংয়ের দুখানা চাদর আনিয়ে গাউসে পাকের পবিত্র গদী শরিফে বসে হলুদ রংয়ের চাদরটা নিজ গায়ে জড়িয়ে পুত্রকে সামনে বসিয়ে গুরু গম্ভীর স্বরে বলেন, 'হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে পবিত্র আমানত আমার হেফাজতে ছিল তা আজ আপনাকে অর্পণ করছি, হেফাজত করবেন।' এ কথা বলে খয়েরী রংয়ের চাদরখানা নিজহাতে ছেলের গায়ে পরিয়ে দেন। ছেলে জিয়াউল হক মিঞার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'আলহামদুলিল্লাহ্'।

পিতার নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক খেলাফত লাভ করে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র হুজরায় শুরু হয় তাঁর বায়াতের (আধ্যাত্মিক দীক্ষা) কাজ। প্রথম দিনেই কয়েকশত লোক বায়াত গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসার পর ক্রমে তা কমে আসে। এ মন্‌জিলে আসার পর আনুষ্ঠানিক বায়াত গ্রহণ করেন মাত্র জনা পঞ্চাশেক এবং ১৯৭৮ সালে এসে আনুষ্ঠানিক বায়াত বন্ধ করে দেন।

তাঁর বায়াতের বিশেষত্ব

একই দোয়া দরূদ নয়, লোকভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে তিনি বায়াত সম্পাদন করতেন। এর প্রতিপালনে লক্ষ্য করা যায় তাঁর একাধিক কালামে– **১.** 'এ দরবারে ভক্তি বিশ্বাসে যারা আসে সবাই মুরিদ।' **২.** ভয়, বিশ্বাস ও আদবের সাথে যারা এ দরবারের ঘেরার মধ্যে প্রবেশ করবে সকলে মুরিদ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক এবং পরবর্তী কামেল অলিরা লম্বা চাদর টেনে বায়াত করার আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে স্বপ্ন ও বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রূহানী ফয়েজ প্রদানের মাধ্যমে বায়াতেই গুরুত্বারোপ করতেন।

হাসানবাগ হতে হক মন্‌জিল

১৩৮০ সালের ৩০ আষাঢ় (১৯৭৩ সাল) বৃহস্পতিবার শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সর্বপ্রথম বাগান বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে পিতা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী এক ঘোষণায় বলেন, "আমার বড় পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে স্বীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে রওজা শরিফ পুকুরের পূর্বদিকে বাগান বাড়িতে দুইকক্ষ বিশিষ্ট বাসগৃহ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করত পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তিনি নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।"

এ ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে বসিয়ে মুরিদ করিয়েছেন, সিংহভাগই ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে ফয়েজ দানের মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন করেছেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রধান খলিফা হযরত বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ প্রথা ছিল সম্পূর্ণভাবে রূহানী জগতের মাধ্যমে। যেখানে দাস্ত বায়াতের কোন প্রসঙ্গই ছিলনা।

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর বিশেষত্ব

তাঁর সমসাময়িককালে এ ভুখন্ডে বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের উত্থানের বিপরীতে তাঁর যে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও প্রভাব ধর্মপ্রাণ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষে ধাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা এতবেশী কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়ে পর্যবসিত। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো তাঁর জীবনী শরিফে এর কিছু চুম্বকসার বর্ণনা পাওয়া যায়। যা পরবর্তীকালের গবেষকদের মূল্যবান তথ্য-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাঁর পুরা জীবনটাই ছিল একটা আধ্যাত্মিক অভিধান। যে অভিধান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারি অতি সহজেই।

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ছিলেন নিজেই একটা জীবন্ত কারামত। যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন, তিনি ছিলেন এমন এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যাঁকে দেখলেই অবচেতনভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়তে ইচ্ছে করতো। শুধু তাই নয়, তাঁকে দেখলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক আবহে আল্লাহ্র কথা স্মরণে পড়ে যেত। বলাবাহুল্য, এটিই ছিল শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর মৌলিক অনন্য বিশেষত্ব। তিনি প্রায় সময় বলতেন 'আমাকে বুঝতে হলে কুরআন দেখ'। তাঁর এই কালামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়, তাঁর সমগ্র জীবন সত্তায়। তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শনে এর প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে তাঁর অবদান: তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। পবিত্র কুরআনের আলোকে দীনহীন জনগোষ্ঠীকে আমলে নিয়ে তাদের বিষয়টি সমাজ জীবনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করছিলেন শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তাঁর কথায়, কাজে ও চিন্তায় এর প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট। তিনি নিজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে

সাহায্য সহযোগিতা করতেন অকাতরে। একইসাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তার কথা বলতেন সর্বত্র। দরবারে আগতদের এ বিষয়ে তাগাদাও দিতেন।

ওফাত

প্রতিদিন প্রায় প্রতিনিয়ত নানা আধ্যাত্মিক রহস্যময় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে মাত্র ৬০ বছর বয়সে ১৯৮৮ সালের ১২ অক্টোবর মধ্যরাত্রি, ১২টা ২৭ মিনিটের সময় তিনি চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সাথে অনন্ত মিলনে মিলিত হন। বৃহস্পতিবার বিকেল সোয়া চারটা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত পর পর তিনটি জামাতে কয়েক লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত 'আজাদী' ও 'পূর্বকোণ'সহ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার ভাষ্যমতে এটি ছিল দেশের দরবার শরিফসমূহের মধ্যে স্মরণকালের বৃহত্তম নামাযে জানাযা। ১৪ অক্টোবর 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ৩ কলামব্যাপী সংবাদের শিরোনাম ছিল এই রকম– 'জানাযায় পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ– শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর দাফন সম্পন্ন।' মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের উদ্যোগে প্রতিবছর ২৬ আশ্বিন তাঁর পবিত্র উরস পালিত হয়।

বংশলতিকা

তাঁর এক পুত্র পাঁচ কন্যা। একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (১৯৬৯)। ৫ কন্যা (১) সৈয়দা জেবউন নাহার, (২) সৈয়দা হুমায়রা বেগম, (৩) সৈয়দা উম্মে কুমকুম হাবীবা বেগম, (৪) সৈয়দা মুনমুন হাবীবা বেগম, (৫) সৈয়দা নূরে আসমা কানিজ ফাতেমা বেগম।

তদীয় পুত্রকে খেলাফত প্রদান

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী তাঁর ওফাতের পূর্বদিন তাঁর একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.)কে খেলাফতে অভিষিক্ত করে যান। যখন খেলাফত পদে অভিষিক্ত হন তখন তিনি সবেমাত্র কলেজের ছাত্র। এ অবস্থায়ও গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানসীন হিসেবে সব্যসাচীর মতো নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি ভক্ত অনুরক্তদের আধ্যাত্মিক পরামর্শ, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে চলতেন প্রতিনিয়ত।

তাঁর স্মরণে প্রকাশনা

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী "মজ্‌জুবে সালেক" অলি ছিলেন। প্রায় প্রতিনিয়ত নানা অলৌকিক ঘটনার জন্যে জীবদ্দশায় তিনি রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হন। তাঁর কারামতপূর্ণ প্রতিদিনের চলমান

ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবদ্দশায় রচিত হয় জীবনীগ্রন্থ– 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'। তদীয় খলিফা সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহের অনুপ্রেরনায় জনাব জামাল আহমদ সিকদার রচিত ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ডিমাই সাইজের ৩০৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয় তাঁর জীবদ্দশায়। বর্তমানে ২০১৭ তে এর ১৩তম সংস্করণ প্রবহমান। এছাড়া সরকারের যুগ্ম সচিব সৈয়দ আমিরুল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ গোলাম রসূল তাঁর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাষায়। সৈয়দ আমিরুল ইসলামের গ্রন্থের নাম 'Shahanshah Ziaul Hoque Maizbhandari' প্রকাশকালঃ ১৯৯২ পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৩০। মোহাম্মদ গোলাম রসুলের গ্রন্থের নাম 'The Divine Spark: Shahanshah Ziaul Hoque (K.)' প্রকাশকাল : ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যাথ ১৪৪।
শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে একটি স্বতন্ত্র মন্‌জিল গড়ে উঠেছে; এটি 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল' – সংক্ষেপে 'হক মন্‌জিল' নামেই সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত। এই 'হক মন্‌জিল' থেকে ১৯৮৫ হতে 'আলোকধারা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবদ্দশায় তাঁর শানে অনেক কবিতা, গান ইত্যাদি রচিত হয়; এমন কি গানের বইও প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক মোঃ মাহবুব উল আলম প্রকাশ করেন গানের বই– 'ঐশি আলোর জলসা ঘর' এবং ১৯৯৭ সালে সম্পাদনা করেন– 'শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী: ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থ। (দ্বি-স-২০০৫) তাঁকে কেন্দ্র করে পূর্বাপর সকল কর্মকাণ্ডকে একীভূত করে গঠিত হয়েছে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট (SZHM TRUST)।

পবিত্র কোরআন-হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ, প্রচার ও প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রপৌত্র এবং ত্বরিকার ধ্রুব নক্ষত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯২৮–১৯৮৮)-এর সম্মানিত উত্তরাধিকারী, অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক ২০১১ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী সাহেবকে ম্যানেজিং ট্রাস্টি হিসেবে মনোনিত করে 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এর কার্যক্রম ১৯৯৫ সাল থেকে চালু ছিল। এই ট্রাস্ট কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদর্শ ত্বরিকার বুজুর্গগণ তাঁদের জীবনে যেভাবে বাস্তবায়িত

করেছেন তারই আলোকে সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা ও সংঘাত নির্মূল করে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ট্রাস্ট মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূল শিক্ষা–বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সর্বজীবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও নিঃস্বদের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত।

কারামত

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারামতের বিষয় পরিলক্ষিত হতো। যাঁদের সাথে এই সমস্ত কারামতের ঘটনা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৬০টি কারামত সংগ্রহ করে তাঁর জীবনীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামতের বর্ণনা

১. তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর ঘটনা, ২. তাঁর নাম স্মরণে ডুবন্ত ট্রলারের নিরাপদে উদ্ধার, ৩. তাঁর দোয়ায় আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার, দশবছর আয়ুবৃদ্ধি, ৪. মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর তাঁর প্রভাব।

কিংবদন্তিতুল্য কারামত – তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর ঘটনা

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর কারামত সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর বিষয়। তাঁর কারামত প্রসঙ্গে এ বিষয়টিই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত। তাঁর সমসাময়িক কালে এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলে প্রায় মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। যারা তাঁর গাড়ি চালাতেন কিংবা যারা তাঁর সফরসঙ্গী হতেন তারা সকলেই অবিসংবাদিত ভাবে একবাক্যে এ বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করতেন। শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনী গ্রন্থে এরকম ৫টি ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরকম একজন প্রত্যক্ষদর্শী ড্রাইভার শামসুল আলম মিয়াজীর (কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম) **বর্ণনা:** আট নয় বছর ধরে আমি মামুজান-কে নিয়ে গাড়ি চালানোর সুযোগ পেয়েছি। ঘটনার সংখ্যা আমি হিসাব করে বলতে পারব না। তবে ড্রাইভার হিসাবে একথাই জানি ও বলতে পারি যে, তেল ছাড়াও মামুজানের গাড়ি চলে। তেল থাকলেও ক্ষতি নাই, না থাকলেও ক্ষতি নাই। বহু সময় ট্যাংকে যে তেল নিয়ে বেরিয়েছি

কক্সবাজারের মতো সুদূর জায়গা চক্কর দিয়ে এসেও দেখি তেল ততটুকুই রয়ে গেছে। এই অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত দেখতে আমি এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এগুলো আমার কাছে মোটেই আশ্চর্য মনে হয় না। এ সব তাঁর শান।

বাণী চিরন্তন: শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী তাঁর আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমায় বেশিরভাগ সময় মজজুব হালে থাকতেন, রীতিমতো মহাসমুদ্রের কল্লোলের মতো। আবার কখনো কখনো একেবারে শান্ত অবস্থায় ফিরে আসতেন অনেকটা শান্ত সরোবরের স্নিগ্ধ জলের মতো। এইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় তিনি অনেক মূল্যবান কালাম ব্যক্ত করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মজজুব হাল অবস্থায় কালাম সমূহে মূলত ত্বরিকা ও স্বীয় মাহাত্ম্যের উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক বর্ণনা এবং শান্ত অবস্থায় জাগতিক জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনাই মূখ্য। তাঁর পবিত্র বাণীসমূহকে নিম্নোক্ত **১৯টি** শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে–

১. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা মাহাত্ম্য, **২.** মাইজভাণ্ডারী দরবার মাহাত্ম্য, **৩.** প্রকৃত অলি-আল্লাহ্র দরবারের বিশেষত্ব, **৪.** দরবার থেকে ফয়েয-রহমত প্রাপ্তির নিয়ম ও কৌশল, **৫.** স্বীয় মাহাত্ম্য, **৬.** ঈমানের তাৎপর্য, **৭.** বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা, **৮.** মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, **৯.** 'নিজেকে জানার' হেকমত বয়ান, **১০.** মারিফতের সাধনায় নামাযের অপরিহার্যতা, **১১.** প্রকৃত বায়াতের দায়-দায়িত্ব, **১৩.** প্রকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা, **১৪.** ভাল কাজকে ইবাদতের সাথে তুলনা, **১৫.** ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে চলার কৌশল, **১৬.** সর্বক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার গুরুত্ব, **১৭.** শিশু-কিশোরদের দরবারে নিয়ে যাওয়ার হেকমত, **১৮.** মানবসেবা ও মানব শ্রেষ্ঠত্ব, **১৯.** জনগণের রাষ্ট্রীয় অভিভাবক হিসেবে সরকারের নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ।

এক নজরে শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বিশেষত্ব

১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রপৌত্র, হযরত বাবা ভাণ্ডারীর দৌহিত্র এবং অছিয়ে গাউসুল আযমের রক্ত ও বেলায়তের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি রূপে তাঁর আবির্ভাব।

২. উল্লিখিত পবিত্র ত্রিধারার সংগম স্থলের অপূর্ব সৃষ্টি হিসেবে শুরু থেকেই তাঁর ব্যতিক্রমী আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব সংশ্লিষ্ট মহলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

৩. বাবার জীবদ্দশায় তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমার স্ফুরণ এবং স্বতন্ত্র সত্ত্বায় বিকাশের সংকেত অনুধাবন করে, একে মর্যাদাপূর্ণভাবে আমলে নিয়ে তদীয় পিতা কর্তৃক স্বতন্ত্র মন্‌জিলে স্বতন্ত্রধারায় বসবাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা।

৪. প্রায় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ জীবনাচরণ, শতশত কারামত এবং হাকিকতী সফর সমূহকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর ৬ দশক থেকেই তিনি রীতিমত কিংবদন্তিতে পরিণত হন।

৫. সমাজ জীবনের প্রায় সর্বস্তরের, বিশেষত রাষ্ট্র, সরকার ও বিদ্বৎ সমাজের স্বনামধন্য বিশিষ্টজনদের মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে আল্লাহ্ ও রাসূলের পথে আকৃষ্ট ও পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন।

৬. জীবদ্দশায় তদীয় একমাত্র পুত্রকে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং তাঁর হেকমতি নির্দেশনায় তদীয়পুত্র কর্তৃক পিতার আরদ্ধ কার্যক্রমকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য 'শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট' গঠন এবং একবিংশ শতাব্দীর আলোকে এ সংগঠনকে পরিচালনার হেকমতপূর্ণ গুরুদায়িত্ব অর্পণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচন ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে শুভ সূত্রপাত করেছিলেন, তার সৃজনশীল বিকাশমান ধারার আরদ্ধ কাজটি নতুনভাবে নতুন মাত্রিকায় জীবন ঘনিষ্ঠভাবে হেকমতপূর্ণ শুদ্ধতম ধারায় প্রবহমান রেখেছে **SZHM TRUST.** আগ্রহী পাঠক এতদবিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন এর নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে– www.sufimaizbhandari.org.bd, Official Facebook Page: Shahanshah Syed Ziaul Huq Maizbhandari Trust.

খোশরোজ ও উরস শরিফ

প্রতি বছর ১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর বার্ষিক খোশরোজ শরিফ এবং ২৬ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর বার্ষিক উরস শরিফ পালিত হয়।

প্রবহমান আধ্যাত্মিক ধারাঃ মাইজভাণ্ডারী খলিফা

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলোঃ তিনি আধ্যাত্মিকতার পরশে দেশ-বিদেশে অসংখ্য কামেল খলিফা নিযুক্ত করে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রচার-প্রসারের ধারা জারী রাখার বিষয়টি সাব্যস্ত করে গেছেন পরিচ্ছন্নভাবে। বিষয়টি যেহেতু আধ্যাত্মিক, সে কারণে এতদবিষয়ে যথার্থ পরিসংখ্যানগত তথ্য উপস্থাপন বড়ই দুঃসাধ্য।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের (১৯০৬) স্মরণে তদীয় খলিফা আমিনুল হক হারবাংগিরী পয়ার ছন্দে দুটো কবিতার বই প্রকাশ করেন-ফকির উল্লাস (১৯০৭) ও ওফাতনামা (১৯০৮)।

এতে দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ও প্রভাব এবং একইসাথে এ সব দেশে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য ফুটে উঠেছে লেখকের নিরাভরণ বর্ণনায়। তাঁর ভাষায়–

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী খোদার ভাণ্ডার।

খোদার প্যারা [পেয়ারা] মাইজভাণ্ডারী ২ সারি সারি নানান দেশে ২ / কামেল সাগ্রিদ [খলিফা] বসাইছে মন সুখে!!

কত আলেম কত মৌলানা ২ করে বিড়ানা [সর্বস্বান্ত] ইঙ্গিত নয়নে / কাজী মুপ্তি [মুফতি] নাএব নবাব ভ্রমায় স্থানে ২!!

(ফকির উল্লাস কবিতা, উদ্ধৃত মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন পৃ. ৩৩৬.)

উল্লেখ্য, এই বর্ণনায় দেখা যায় আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিদের 'খলিফা' উল্লেখ না করে 'কামেল সাগ্রেদ' বলে অভিহিত করেছেন। এ তথ্যসূত্রের পর মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিদের 'খলিফা' নামে অভিহিত করে এগুলোর পরিসংখ্যানগত তথ্য সর্বপ্রথম লিখিতভাবে উপস্থাপন করেন অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে 'হযরত আকদাসের বেলায়তপ্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের নাম' শিরোনামে ৫৫ জন খলিফার একটি তালিকা (ঠিকানাসহ) প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এ তালিকার ভূমিকাংশে পরিসংখ্যানগত বিষয়ে তিনি যে সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন এখানে তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য–

'তাঁহার (হযরতের) পবিত্র করুণাধারা অর্জনে যাহারা ধনী হইয়া খোদা অন্বেষণে অলি-আল্লাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার খেলাফত অর্জন করিয়া সুপরিচিত হাদিয়ে কামেল হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংগৃহীত তথ্যগুলিও এই সাধারণ ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই নমুনা স্বরূপ কয়েকজন সুপরিচিত স্মৃতিধারী অলি-আল্লাহ্র নাম নিম্নে দেওয়া হইল।'

পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক' গ্রন্থে 'হযরতের বিশিষ্ট মুরিদানের নাম' শিরোনামে ১৩৫ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এ তালিকার শেষে এতদবিষয়ে যে মন্তব্য তাও প্রণিধানযোগ্যঃ

'যাহারা প্রথম অবস্থায় তাঁহার ফয়েয বরকত হাসিলের পরে অন্য ব্যক্তি তাঁহার কামেল মুরিদের অনুগ্রহ লাভে মুরিদ নামে আমার নিকট পরিচিত, কার্যত তাহাদের নাম আদর্শগত কারণে এ স্থলে উল্লেখে বিরত রহিলাম। আমি সায়ের পীরি ব্যবসা করিনা, তাই আমার প্রত্যক্ষ অবগতির অভাবে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নামও বাদ যাইতে পারে, কাজেই এ ভুল মার্জ্জনীয়।' (পৃ.৭)

এর পর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাত শত বার্ষিকী স্মারক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিষদের ৪ নং প্রকল্প–আওলাদে খোলাফায়ে গাউসুল আযম জরীপ কার্যক্রম সূত্রে ২২ জন খলিফার নাম সংযুক্ত হয়েছে। এই তিন সূত্রে প্রাপ্ত ও সমন্বিত ১৬২ জনের একটি তালিকা 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ঃ শত বর্ষের আলোকে' গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সন্নিবেশিত করা হয়।

সম্প্রতি Khalifa of Ahmed Ullah Maizbhandari শিরোনামে www.rahebhander.com এ গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর ২০৪ জন খলিফার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বোক্ত ১৬২ জন তালিকার বাইরে এখানে নতুন ৪২ জনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের যে তথ্যসূত্র এবং সূত্র সংগ্রহের যে পন্থা সকল দিক বিবেচনা করে এতদবিষয়ে আরো দায়িত্বশীল গভীর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

বি:দ্র: মাইজভাণ্ডার বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে মাইজভাণ্ডারী খলিফার তথ্য সংগ্রহ, প্রামাণ্য ও নিশ্চিতকরণ এবং গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে তা তালিকাভুক্ত করণের কাজটি রীতিমতো আধ্যাত্মিক ধারণায় সমৃদ্ধ প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের শ্রম, মেধা, একাগ্রতাকেন্দ্রিক সময়-সাপেক্ষ গবেষণার বিষয়।

প্রতি বছরের আনুষ্ঠানিক আয়োজনঃ মাইজভাণ্ডারী উরস

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬-১৯০৬) তাঁর জীবন সায়াহ্নে একদিন প্রতিবেশী আশেক-ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলেন–

"তোমরা হিসাব কর দেখি ১২০ টি গরু (অনুরূপ ভইস, ছাগল ভেড়ার সংখ্যাও উল্লেখ করে) পাক করিয়া খাওয়াইতে কী পরিমাণ চাউল, মরিচের গুড়া, ডাইলের গুড়া এবং কয় খাঁচি মুলা লাগিবে?" (জীবনী ও কেরামত, পৃ. ২১৫)

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের মেজবান-সংস্কৃতিতে কলাইর গুড়ার ডালের প্রচলন ছিল বেশী, আর মূলা হল সুনির্দিষ্টভাবে শীত মওসুমের সবজি, যা পুরো শীতে– মাঘ মাসে তাঁর ওফাতের ইঙ্গিতবাহী। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পৌত্র ও জীবনীকার সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী তাঁর বাল্যস্মৃতি থেকে উল্লিখিত বর্ণনা এবং পূর্ণ শীত মওসুমে মাঘ মাসে হযরতের ওফাতের পর ১৯০৭ সাল থেকে চলে আসা ১০ মাঘের উরসের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

"প্রতি বৎসর ১০ মাঘ এই মহান বিশ্বঅলি গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) পরম করুণাময়ের নূরীজাতে শুভ-মিলন দিবসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জন সমাগমে এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মেলন সমূহের মধ্যে বর্তমানে পঞ্চম। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্ত ও জায়েরীনগণ পবিত্র মাজারের পাশে শ্রদ্ধাবনতভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী স্বাধীন ও প্রথানুসারে প্রত্যেকের ধর্ম-কর্মে রত থাকেন। নামাযের সময় বিভিন্ন তাঁবু ও সামিয়ানার তলে, মসজিদ ও ইবাদত গাহে উপাসনারত কাতারবন্দী মানুষ এক অপরূপ ও অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। এই প্রেম-পাগল মেলায় 'সালাতে দায়েমী' রত প্রেমিকদের করুণ কান্না গীতি, বাদ্যধ্বনি ও জিকির ইবাদতের অভিনব অবস্থা দর্শনে হাশর ময়দানের অনুরূপ দ্বিতীয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাত বারোটার পর সমস্ত বাদ্য জনিত সামা জিকির বন্ধ করিয়া মিলাদে নববী ও হযরত আকদাসের তাওয়াল্লোদ শরিফ পাঠান্তে ফাতেহাখানি সমাধা করা হয়। অতঃপর সেবকদল ক্যাম্পে ক্যাম্পে শৃঙ্খলার সহিত তবরুক পৌঁছাইতে থাকেন এবং জেয়াফত পদ্ধতিতে জায়েরীন ও পর্যটকদিগকে আহারীয় সামগ্রী বিতরণ করেন।" – (জীবনী ও কেরামত, পৃ. ২১৪-২১৫)

উল্লেখযোগ্য উরস মোবারক

১০ মাঘ [২৪ জানুয়ারি] গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) [প্রকাশ হযরত কেবলা] (১৮২৬–১৯০৬) এর বার্ষিক উরস মোবারক।

২২ চৈত্র [৫ এপ্রিল] গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) [প্রকাশঃ হযরত বাবা ভাণ্ডারী] (১৮৬৫–১৯৩৭) এর বার্ষিক উরস মোবারক।

২৬ আশ্বিন [১১ অক্টোবর] গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রপৌত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৯২৮–১৯৮৮) এর বার্ষিক উরস্ মোবারক এবং ১০ পৌষ [২৫ ডিসেম্বর] খোশরোজ শরিফ।

আত্মার উন্নয়নে মাইজভাণ্ডারী গান ও সামার ভূমিকা
কুরআন সুন্নাহর আলোকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার এক হেকমতি হাতিয়ার

জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক, সুক্ষ্ম কিংবা স্পর্শকাতর যে কোন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যে পূর্বশর্তটি বড়ই আবশ্যক তা হলো একাগ্রচিত্ততা। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একাগ্রচিত্ততা সকল সফল ইবাদতের চাবিকাঠি। সুফি পরিভাষায় একে বলা হয় 'হুজুরে ক্বল্ব'। বলাবাহুল্য, এ হুজুরে ক্বল্বের অভাবে শরিয়ত মতে ইবাদত সহীহ হলেও চূড়ান্ত বিচারে কবুল হবে কিনা সন্দেহ থেকেই যায়। এ সন্দেহ দোলায়িত প্রেক্ষাপটে 'হুজুরে ক্বল্ব' আনয়নের ক্ষেত্রে হেকমতি হাতিয়ার হলো জিকিরে জলী বা প্রকাশ্য জিকির, যার এক আনুষ্ঠানিক রূপ সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধনা। যেমন: হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্তী ভারতবর্ষে এসে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ ভূখন্ডের অধিবাসীদের বাদ্যপ্রিয় মজাকী রুচি সম্পন্ন ভাবকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের রুচি অনুযায়ী গান বাদ্যকে ত্বরিকতের হেকমতি উপাদান হিসেবে গ্রহণ ও অনুমোদন করে ভারতবাসীকে হিদায়ত করতে সক্ষম ও সফলকাম হয়েছিলেন ঐতিহাসিকভাবেই; যা বিশ্ব ত্বরিকতের ইতিহাসেও এক মাইলফলক। গান বাদ্যের মাধ্যমে অন্তরে হুজুরে ক্বল্বের অনুশীলনের

ক্ষেত্রে এ ধারা খোদা-প্রেম পথচারীকে বাজে ধ্যান থেকে ফিরিয়ে নদীর স্রোতের মতো ভাব প্রবণতার ভেতর দিয়ে খোদা প্রেম-বিভোর মহাসাগরের সাথে সংযোগ করে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

পবিত্র কুরআনে ইবাদতের ধারায় আল্লাহ্‌কে স্মরণের ক্ষেত্রে হুজুরী ক্বল্‌বের বান্দার অবস্থানের বিষয়টি দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে যে কোন অবস্থায় অনুমোদিত। পবিত্র হাদিসেও এর সমার্থক ও সম্পূরক অনুমোদন মেলে– খোদার একটি জজ্‌বা বা প্রেমবিভোর অবস্থা দু'জাহানের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে বুঝা যায়, নৃত্যমান জিকিরের কৌশল নতুন কিংবা অনৈসলামিক কোন পদ্ধতি নয়, এটি সনাতন ইসলামী হেকমতেরই একটি ধারা। আজ থেকে সাতশো বছর আগে কোনিয়াতে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মৌলবীয়া ত্বরিকার DANCING DARBESH এর কথাতো আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিশ্ব ত্বরিকতের ইতিহাসে সর্বজনবিদিত।

সুতরাং সৎ উদ্দেশ্যে গান-বাজনা ইসলামের বিরোধী বা সাংঘর্ষিক নয়; বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সহায়ক মাত্র; যা নবী করিম (দ.) এর বেলায়তের এক যুগোপযোগী সর্বজনীন কৌশল হিসেবেই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় এ হেকমতি কৌশল প্রয়োগের, এর যথার্থ সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তির কিছু পূর্বশর্ত বিদ্যমান। এ ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী তাঁর 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া' গ্রন্থে (পৃ.২) এর ১২টি বিধিবদ্ধ নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। হুজুরী ক্বল্‌ব নিয়ে সামার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার বিষয়টি সমকালীন সামগ্রিক ত্বরিকতের ইতিহাসেও বেশ আলোচিত।

এর গুণগত বিশেষত্বের কারণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সামা অন্যান্য ত্বরিকাকেও স্পর্শ করে। নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকায় যেখানে 'জিকিরে খফি'ই (নীরব জিকির) মুখ্য, তাঁরাও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অমোঘ অস্ত্র হিসেবে মাইজভাণ্ডারী সামাকে অবলোকন করেন সমীহ জাগানিয়া উচ্চতর মর্যাদায়। এ প্রসঙ্গে নক্‌শবন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকার সমকালীন পীরে কামেল মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তাকীম হাশেমীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য– "মাইজভাণ্ডারের সামা ও ঢোলবাদ্য আশেকের হৃদয়কে বিপুলভাবে নাড়া দেয়। যাঁদের ক্বল্‌ব জারী আছে তাঁদের ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডারী সামা ও ঢোলবাদ্য যেন সোনায় সোহাগা'।" (গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী: শতবর্ষের আলোকে, পৃ. ২৭৮)

এ প্রসঙ্গে অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক বলে একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য: "আপনচিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নূরের খনি, সকল আঁধার দূর হয়ে যায় মানুষ হয় অন্তর্যামী।"
সাধারণ ইনসানকে 'ইনসানে কামেলে'র পথে উত্তরণের ক্ষেত্রে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিকে একাত্ম করে নেওয়ার বহুল আলোচিত ও চিরায়ত সাধনার অন্যতম গোপন চাবিকাঠি এ হুজুরী ক্বল্‌ব। এই একাগ্রচিত্ততারই অপর নাম আপনচিত্তে বিভোরতা। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় এই কাঙ্ক্ষিত ভাব-বিভোরতা আনয়নের শক্তিশালী হেকমতি হাতিয়ার সামা; সাধারণ্যে যার সর্বজনীন পরিচয়– মাইজভাণ্ডারী গান।

দরবার শরিফের বিভিন্ন মন্‌জিল পরিচিতি

দরবার শরিফের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্‌জিল হলো

১. গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল
২. গাউসিয়া রহমান মন্‌জিল
৩. গাউসিয়া হক মন্‌জিল
৪. গাউসিয়া আমিন মন্‌জিল।

গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল: মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর নামানুসারে এই মন্‌জিলের নাম গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল।
গাউসিয়া রহমান মন্‌জিল: গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও তদ্বীয় প্রধান খলিফা গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুত্‌বুল আকতাব সৈয়দ গোলাম রহমান [প্রকাশ ঃ বাবাভাণ্ডারী] এর নামানুসারে এই মন্‌জিলের নাম গাউসিয়া রহমান মন্‌জিল। হযরত বাবাভাণ্ডারীর আওলাদগণ এই মন্‌জিলে বসবাস করেন।
গাউসিয়া হক মন্‌জিল: হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর প্রথম পুত্র শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর নামানুসারে এ মন্‌জিলের নামকরণ হয় গাউসিয়া হক মন্‌জিল। এ মন্‌জিলে বর্তমান সাজ্জাদানশীন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃ) সহ শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পরিবার বর্গের বসবাস।
গাউসিয়া আমিন মন্‌জিল: গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলিফা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের নামানুসারে এ মন্‌জিলের নামকরণ।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাধন পদ্ধতির অন্যতম বিশেষত্ব সামা এবং হালকা জজ্‌বা। এ দুটো প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা সর্বজনস্বীকৃত।
'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের চল্লিশ দিন (মতভেদে ৪৩ দিন) পূর্বেই তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। গাউসে পাকের রওজা শরিফের সাথে পূর্ব কক্ষে তাঁর মাজার অবস্থিত।

মাইজভাণ্ডারী বংশ লতিকা

পবিত্র আওলাদে রসূল (দ.) মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক ও পূর্ণতাদানকারী গাউসুল আযম শাহ্ সুফি 'সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮২৬–১৯০৬)

শাহজাদা-ই-গাউসুল আযম বেলায়তে মা'আব মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮৬৫–১৯০২) একমাত্র কন্যা: সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসা (প্রকাশ তোতা ময়না)।

সাজ্জাদানশীন ও অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী [১৮৯৩-১৯৮২] (পাঁচ পুত্র)

১. শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৯২৮–১৯৮৮) – সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (১৯৬৯)
২. সৈয়দ মুনিরুল হক মাইজভাণ্ডারী - (১৯৩২-২০০৬)- সৈয়দ আহমদ হোসাইন শাহরিয়ার, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন সোহেল (১৯৭১)
৩. সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯৩৬)
৪. ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯৪৫)
৫. সৈয়দ সহিদুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯৫১)

(মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর পুত্রধারার বংশলতিকা।)

শাজারায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

০১. ইলাহি বেহুরমতে সৈয়দুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল আউলিয়া, শফিউল মোয্নিবিন, খাতেমুন নবিয়্যিন, রাহ্মাতুল্লিল আলামিন, হযরত আহমদ মোজ্তবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়াসহাবিহী ওয়া আউলিয়ায়ে উম্মাতিহি ওয়াসাল্লামা তাসলিমান কাসিরা।
০২. ইলাহি বেহুরমতে আসাদুল্লাহিল গালিব আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু।
০৩. ইলাহি বেহুরমতে সৈয়দুস্ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
০৪. ইলাহি বেহুরমতে হযরত ইমাম সৈয়দ জয়নুল আবেদীন কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
০৫. ইলাহি বেহুরমতে হযরত ইমাম সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
০৬. ইলাহি বেহুরমতে হযরত ইমাম সৈয়দ জাফর সাদেক কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
০৭. ইলাহি বেহুরমতে হযরত ইমাম সৈয়দ মূসা কাযেম কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
০৮. ইলাহি বেহুরমতে হযরত ইমাম সৈয়দ আলী ইবনে মূসা রযা কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
০৯. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শায়খ্ মারুফ কর্খী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১০. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শায়খ্ সির্রে সক্বতী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১১. ইলাহি বেহুরমতে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১২. ইলাহি বেহুরমতে হযরত আবু বকর শিবলী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১৩. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শায়খ্ আবদুল আযিয তামিমী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১৪. ইলাহি বেহুরমতে হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তামিমী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১৫. ইলাহি বেহুরমতে হযরত আবুল ফারাহ্ ত্বরতূসি কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু।
১৬. ইলাহি বেহুরমতে হযরত মওলানা আবুল হাসান কোরাইশী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।
১৭. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শায়খ্ ইবনে মোবারক আবু সায়িদ মাখ্যূমী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

১৮. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শায়খুশ্ শুয়ূখ কুত্বুল আলম গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

১৯. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহাবুদ্দিন সোহ্রাওয়ার্দি কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২০. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি নেযামুদ্দিন গজনবী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২১. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোবারক গজনবী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২২. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি নজমুদ্দিন গজনবী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৩. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি কুত্বুদ্দীন রওশন জমীর কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৪. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি ফজলুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৫. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি মাহমূদ কাদেরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৬. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ নাসিরুদ্দিন কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৭. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি তকীউদ্দীন কাদেরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৮. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি নেযামুদ্দিন কাদেরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

২৯. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহলুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩০. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জাফর হোসাইনী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু।

৩১. ইলাহি বেহুরমতে হযরত শাহ্ সুফি খলিলুদ্দিন কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩২. ইলাহি বেহুরমতে কুত্বুল আকতাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ মুনি্য়ম কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩৩. ইলাহি বেহুরমতে সাহেবুত্ তাযিম ওয়াত্ তাক্রিম মুতাওয়াক্কাল আলাল হাইয়িল কাইয়িম হযরত শাহ্ সুফি মোহাম্মদ দায়েম কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩৪. ইলাহি বেহুরমতে হযরত হাদিয়ে আশেকীন শাহ্ সুফি আহমদুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩৫. ইলাহি বেহুরমতে হযরত হাজী শাহ্ সুফি লকিতুল্লাহ্ কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩৬. ইলাহি বেহুরমতে হযরত হাজীউল হারামাইন শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ সালেহ্ লাহোরী কাদ্দাসাল্লাহু সির্রাহু।

৩৭. ইলাহি বেহুরমতে মত্লুবুত্ ত্বলেবিন, যুব্দাতুল আরেফিন, সুলতানুল মোক্বর্রাবিন, কুত্বুস্ সামাওয়াতি আর্দ্বিন, নূরুল আলম, খাতেমুল আউলিয়া, ফরদুল আফরাদ, গাউসুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

৩৮. ইলাহি বেহুরমতে সুলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোক্বারা, অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৩৯. ইলাহি বেহুরমতে রূহুল আরেফিন, সুলতানুল মাশুকিন, অলিয়্যুল আলামিন, শাহানশাহ্ হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু।

৪০. ইলাহি বেহুরমতে সাহেবে মাক্বামাত, মাখ্যানে কাশ্‌ফে ওয়া কারামাত, মাম্বায়ে ফুয়ূযাত, মাযহারে গাউসুল আযম, রাহ্‌বারে আলম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী মাদ্দা যিল্লুহুল আলী।

– দামা ফুয়ূজাহু ইরহাম আবদাকা ওয়াজআলহু সায়ীদান ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ।

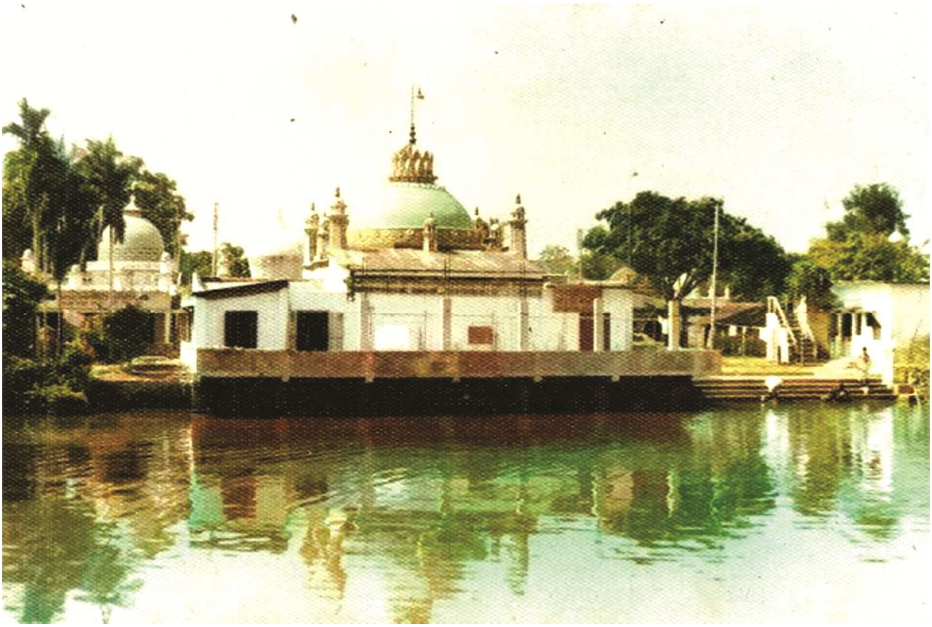

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর
রওজা শরিফ (পুরনো ছবি)

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্
মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর রওজা শরিফ (বর্তমান)
তাঁর পাশে:
বেলায়তে মা'আব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ
ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
এবং
কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক
ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মাজার শরিফ

গাউসুল আযম বিল বিরাসাত হযরত শাহ্ সুফি
সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর রওজা শরিফ

অছি-ই-গাউসুল আযম, খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর রওজা শরিফ

শাহানশাহ্ হযরত শাহ্ সুফি
সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর রওজা শরিফ

মাইজভাণ্ডার বংশলতিকা

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী খাতেমুল অলদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)'র [১৮২৬-১৯০৬] পুত্রধারার বংশলতিকা

↓

বেলায়তে মা'আব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক ফানা-ই ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৬৫-১৯০২]

↓

- হযরত সৈয়দ মীর হাসান মাইজভাণ্ডারী (র.) [১৮৯১-১৯০৬]
- অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৯৩-১৯৮২]

↓

- বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৯২৮-১৯৮৮]
  - সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (১৯৬৯)
- শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল হক মাইজভাণ্ডারী (র.) (১৯৩২-২০০৬)
- শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯৩৬)
- শাহ্ সুফি সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯৪৫)
- শাহ্ সুফি সৈয়দ সহিদুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯৫১)

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ভ্রাতাদের পুত্রধারার বংশলতিকা

দ্বিতীয় ভ্রাতা : সৈয়দ আবদুল হামিদ

- সৈয়দ নূরুল হক
- কুত্বুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)

তৃতীয় ভ্রাতা : সৈয়দ আবদুল করিম

- সৈয়দ গোলাম সোবহান
- গাউসুল আযম বিল বিরাসাত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ: হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) [১৮৬৫-১৯৩৭]
  - সৈয়দ খায়রুল বশর
  - সৈয়দ আবুল বশর
  - সৈয়দ মাহবুবুল বশর
  - সৈয়দ শফিউল বশর
- সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম
- সৈয়দ আব্দুল ওহাব
- সৈয়দ আবদুল ওয়াদুদ
- সৈয়দ আবদুল হাদী

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN No.- 978-984-8083-20-8